GLOBAL BUSINESS
October 2024 BDT 100 $ 10

বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪

Powered by

DHAKA BANK PLC.

রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি | EXIM BANK | অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. Agrani Bank PLC. | উত্তরা ব্যাংক পিএলসি. | বি এ এক্সপ্রেস

আয়োজনে

BUCCI Bangladesh-USA Chamber of Commerce and Industry | মুক্তধারা MUKTADHARA NEW YORK INC. | USA-BANGLADESH BUSINESS LINKS

Food partner

Health Partner

GOLDEN AGE HOME CARE

AUTHENTIC BANGLADESHI FOOD

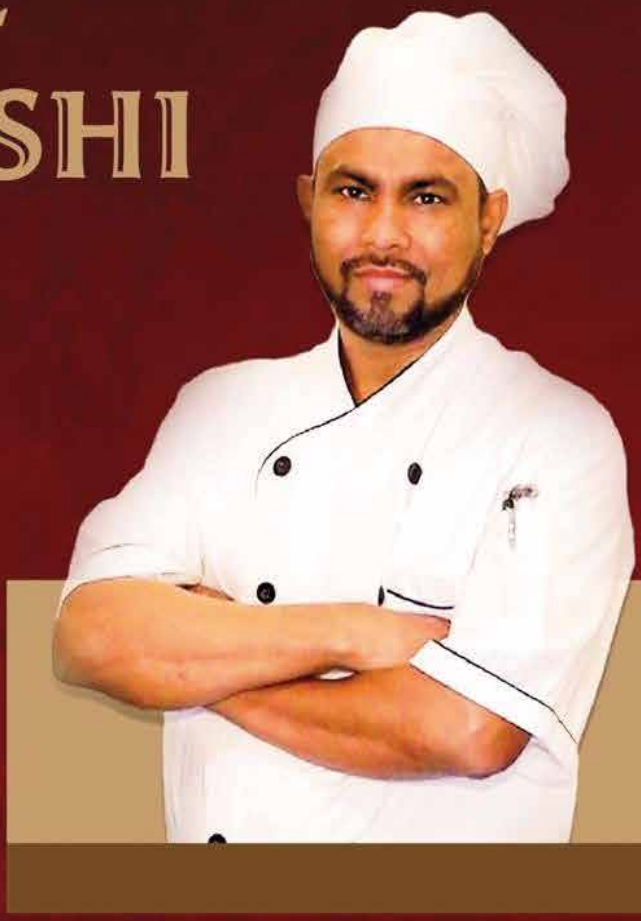

Khalil Biryani House

NYC Small Business Services
MBE Certified

Khalil Biryani House

BRONX LOCATION
2062 McGraw Ave,
Bronx, NY 10462
646.763.5073

JAMAICA LOCATION
167-20 Hillside Avenue,
Queens, NY 11432
718.608.0221

www.khalilsfood.com

@khalilhalalchinese @khalilbiryanihouse

GLOBAL BUSINESS
September 2024 BDT 100 $ 10

বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪

আহ্বায়ক	:	জিয়াউদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম আহ্বায়ক	:	রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী
সম্পাদক	:	বিশ্বজিত সাহা
নির্বাহী সম্পাদক	:	শ্যামল দত্ত
যুগ্ম সম্পাদক	:	ফারুক আহমেদ
সহযোগী সম্পাদক	:	নাজিয়া হাসান খন্দকার
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	:	মধু সূদন সাহা
সমন্বয়ক	:	নূরুল বাতেন
বৈদেশিক ব্যবস্থাপক	:	রিতেশ সাহা
কভার ডিজাইন	:	দেওয়ান আতিকুর রহমান
গ্রাফিক্স অলংকরণ	:	আনোয়ার হোসেন
বিক্রয় ও বিপণন	:	আবদুর রহিম

নিউ ইয়র্ক অফিস	:	৩৭-৬৯, ৭৫ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: +১ ৩৪৭-৬৫৬-৫১০৬ ই-মেইল: usabdbusinesslinks@gmail.com ওয়েব সাইট: www.ubbl.org
ঢাকা অফিস	:	৪৪ আরামবাগ, ২য় তলা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ফোন: 01733 064328, 0187 6667511

International Business Magazine
A Muktadhara New York Publication

Published By
USA-Bangladesh Business Links LLC

www.bangladeshremittancefair.com

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ইসলামী ব্যাংক ১৮ বছর ধরে দেশের শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক *মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ*	১৩
রিজার্ভ গঠন ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স *শেখ মোহাম্মদ মারুফ*	১৫
রেমিট্যান্স বাড়ছে না কেন *ড. বিরূপাক্ষ পাল*	১৭
মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যয় হোক প্রবাসী আয় *ফারুক মঈনউদ্দীন*	২১
ডলারের দ্বিতীয় বড় উৎস হবে অফশোর ব্যাংকিংয়ের আমানত *মাসরুর আরেফিন*	২৩
কর্মী দক্ষ করে না পাঠালে রেমিট্যান্স বাড়বে কীভাবে *ড. আলী আকবর মল্লিক*	২৫
টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রবাসী আয়ের গুরুত্ব *অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার, মো: হাসানুর রহমান (হাসান)*	২৭
বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াব কীভাবে *মামুন রশীদ*	২৯
শুধু প্রবাসী আয় বাড়ানো নয়, আরও যা যা করতে হবে *মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার ও কে এম নূর-ই-জান্নাত*	৩১
যে উপায়ে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভিআইপি মর্যাদা দেয়া যায় *মাসুদ খান*	৩৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন রেমিট্যান্স প্রবাহের শীর্ষে আরব আমিরাত; পিছিয়ে সৌদি আরব *এম মনিরুল আলম*	৩৯
রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা অতি জরুরি *ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী*	৪১
রেমিট্যান্স, অর্থপাচার ও হুন্ডির ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ *ফরেস্ট কুকসন*	৪৩
অফশোর ব্যাংকিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা *নিরঞ্জন রায়*	৪৭
রেমিট্যান্স ইনফ্লো ও আউটফ্লো *ড. মাহবুব উল্লাহ্*	৪৯
রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যোগান *অজয় দাশগুপ্ত*	৫১
দেশের উন্নয়নে রেমিটেন্স যোদ্ধা *ড. মোঃ আইনুল ইসলাম*	৫৩

শুভেচ্ছা বার্তা

সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই), যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেনে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমরা মনে করি আটলান্টিক পেরিয়ে লাল-সবুজের এক টুকরো বাংলাদেশকে যথাযথ মর্যাদায় তুলে ধরাই মেলা আয়োজকদের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই এবং আয়োজকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ৫০ বছর পূর্তিও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। কাজেই এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' আয়োজন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ব ফোরামে বাংলাদেশের পরিচিতি এবার এক আলাদা মাত্রা পাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে রেমিট্যান্স অপরিহার্য। প্রবাসে বসবাসরত যে বাংলাদেশিরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে পাঠান, তাদেরকে আমরা রেমিট্যান্স যোদ্ধা মনে করি। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। এজন্য রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ। রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ দেশের জিডিপিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য রেমিট্যান্স খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সম্মিলন ঘটানো। আমরা আশা করি এই মেলার মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে নিরাপত্তা ও মর্যাদার বিষয়টি সবার কাছে আরো বেশি সুস্পষ্ট হবে। রেমিট্যান্স প্রেরকরা আরো বেশি সচেতন হবারও সুযোগ পাবেন, যাতে তারা বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত হন। এইসাথে ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল প্রোভাইডার, অ্যাপ ডেভেলপার, মানি এক্সচেঞ্জ হাউসসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো মেলায় তাদের সেবা প্রদানের সুবিধাগুলো প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।

আশার কথা, অতি সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহ দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বরের মতো চলতি মাস অক্টোবরেও প্রবাসী আয়ের এই ইতিবাচক প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র মতে, অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। সে হিসাবে প্রতিদিন রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় সাড়ে আট কোটি ডলার। সূত্র মতে, আগের বছরের একই সময় এসেছিল ৩২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। অর্থাৎ আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে চলতি মাসে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশি। গত দুই মাসে ভালো প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩৩.৩৩ শতাংশ।

এ বছর মেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে: 'রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স (Remittance for Reserve Building and Growth)', যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনেও আমরা আনন্দিত। আমরা মনে করি ২০২৪ সালের ২০ ও ২১ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সম্মানজনক মেলা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশি বিদেশি সকল প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এইসাথে মেলার আয়োজকদের জানাচ্ছি আবারও কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
সোনালী ব্যাংক পিএলসি

শুভেচ্ছা বার্তা

সময়ের পালাবদলে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে পরিবর্তনের নতুন দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আয়োজিত **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** এর আয়োজন একটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ। আমি এ উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজক, রেমিট্যান্স পার্টনার, অংশগ্রহণকারী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা, প্রবাসী ব্যবসায়িক সম্প্রদায় তথা আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে এবারের মেলার, **'রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স'** যা বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে সম্ভাবনাময় উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে আমাদের পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে। উল্লেখ্য, প্রবাসী রেমিট্যান্স বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহের প্রধান উৎস। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে আমদানিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা পূরণ করে থাকে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। তাই আমাদের অর্থনীতির ধারাবাহিক উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে রেমিট্যান্সের প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

বিশ্বের পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট ও নানা সংকটের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর লক্ষণীয় পতন পরিলক্ষিত হয়। তাই এই মুহূর্তে রিজার্ভ এর উর্ধ্বগামী প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। আমরা তাঁদের দেশপ্রেম, অর্থনীতিতে তাঁদের ধারাবাহিক অবদানকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি। আমাদের দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তির একটি বড় অংশের বসবাস যুক্তরাষ্ট্রে। আমাদের আবেদন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রবাসীরা তাঁদের গৌরবময় অবদানে আরো বেশি মনোযোগী হবেন এবং ব্যাংকিং ও বৈধ পথে তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স পাঠাবেন।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাসীদের অমূল্য রেমিট্যান্সের যথাযথ প্রতিদান নিশ্চিত করতে দেশের বর্তমান সরকার যথেষ্ট সক্রিয় ও উৎসাহী বলে আমার বিশ্বাস। উন্নত বিশ্বের চাহিদা, প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুততা, স্বাচ্ছন্দ্য ও লাভজনক বিনিময়ে তাঁদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। প্রবাসীদের অবদান মূল্যায়ন করে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে আমি সাধুবাদ জানাই। যেমন, প্রবাসীদের বিশেষ মর্যাদা, প্রেরিত অর্থের উপর আকর্ষণীয় নগদ প্রণোদনা, বাজারভিত্তিক আকর্ষণীয় নতুন মুদ্রা বিনিময় হার, আকর্ষণীয় মুনাফার সমাহারে বৈদেশিক মুদ্রানির্ভর বিভিন্ন বিনিয়োগ বন্ডের প্রচলন প্রভৃতি।

বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত এবং স্বনামধন্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি প্রবাসীদের প্রতি সরকারের এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশব্যাপি শাখা-উপশাখা-সেবাকেন্দ্রের সমাহারে একটি সুবিস্তৃত সার্ভিস নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও অংশীদারিত্ব এবং বিশ্বব্যাপি বেশ কিছু একচেঞ্জ হাউজ, মানি ট্রান্সফার অপারেটর ও করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ঢাকা ব্যাংক পিএলসিকে পরিণত করেছে রেমিট্যান্স বিতরণের এক উর্বর প্ল্যাটফর্মে। প্রবাসী বিনিয়োগের নিরাপদ গন্তব্য হতে অতি সত্বর মানানসই ডিপোজিট ও বিনিয়োগ পণ্যের প্রচলন করতে প্রস্তুত আমাদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান।

লেনদেনের আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুযায়ী, হুন্ডির অনৈতিক পথে রেমিট্যান্সের প্রবাহ মোটেও কাম্য নয়। এটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আমাদের প্রিয় দেশকে আস্থার সংকটে ফেলে দেয়। জন্ম নেয় নানা অপরাধ এবং অবৈধ সিন্ডিকেট। তাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, আইনসম্মত ও সুবিধাজনক পন্থা হলো ব্যাংক কিংবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত চ্যানেলে দেশে অর্থ প্রেরণ করা। পরিবর্তনের ইতিবাচক ধারায় আমরা ভবিষ্যতের উপর আস্থা রাখছি। সকলের প্রত্যাশা, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগের সমস্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর হবে।

দেশকে ভালোবেসে ভালো কিছু করার ও দেশীয় উন্নয়নের নিরন্তর অংশীদার হওয়ার এখনই উৎকৃষ্ট সময়। সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

(আব্দুল হাই সরকার)
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস
ও চেয়ারম্যান, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি।

শুভেচ্ছা বার্তা

রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশের অন্যতম পথিকৃত ব্যাংক হিসাবে ন্যাশনাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই), যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক সম্মিলিতভাবে **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** এর আয়োজন করেছে শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্জনসমূহকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার এই প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশের অন্যতম রেমিট্যান্স বান্ধব ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে এমন মহতি একটি উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের যাত্রা শুরুর সেই মাহেন্দ্রক্ষণের কথা মনে পড়ছে। প্রথম উদ্যোগী ব্যাংক হয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যাশনাল ব্যাংকের সেই পথ চলায় মুখ্য ভূমিকা পালনের সৌভাগ্য মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ ও গ্রিসসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউসের বিস্তার ঘটিয়ে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আহরণে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছি। আশা করছি, ভবিষ্যতেও এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে ও বেগবান করতে বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রবাসে বসবাসরত যে বাংলাদেশিরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসাবে দেশে পাঠান তারাই আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা। মনে রাখতে হবে, এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারাই আমাদের দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পালন করছেন অসামান্য ভূমিকা। তাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে তথা রেমিট্যান্স খাতের সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সম্মেলন সঠিকভাবে ঘটাতে পারলে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সামনে অবারিত হবে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণের সুযোগ, বৃদ্ধি পাবে রেমিট্যান্স প্রেরণে তাদের নিরাপত্তা ও সচেতনতা। একই প্যাটফর্মে ব্যাংক থেকে শুরু করে এমএফএস, সার্ভিস প্রোভাইডারস ও এক্সচেঞ্জ হাউসসমূহের এই মিলনমেলা নিঃসন্দেহে তাই এক মহতি উদ্যোগ।

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অতি সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই-বোনদের রেমিট্যান্স প্রেরণে জোয়ার এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রমতে, চলতি অক্টোবর মাসের প্রথম বারো দিনে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১০০ কোটি ডলার; অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় সাড়ে আট কোটি ডলার। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত বছরের তুলনায় রেমিট্যান্সের এই প্রবৃদ্ধি মোট রেমিট্যান্সের প্রায় এক তৃতীয়াংশ যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এক বড় সুখবর ।

তাই নিঃসন্দেহে এবারের **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** এর মূল প্রতিপাদ্য "রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স Remittance for Reserve Building and Growth' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে ২০ ও ২১ অক্টোবর, ২০২৪' তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সম্মানজনক এই মেলা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে- এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি, মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও এই মেলার অয়োজকদের প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা।

(আবদুল আউয়াল মিন্টু)
চেয়ারম্যান
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই), যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা মনে করি আটলান্টিক পেরিয়ে বিশ্ব ফেরামে ধরাই মেলা আয়োজকদের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই এবং আয়োজকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ৫০ বছর পূর্তিও উদযাপিত হচ্ছে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' আয়োজন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ব ফোরামে বাংলাদেশের পরিচিতি এবার এক আলাদা মাত্রা পাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে রেমিট্যান্স অপরিহার্য। প্রবাসে বসবাসরত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। এজন্য রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ। রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ দেশের জিডিপিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য রেমিট্যান্স খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সম্মিলন ঘটানো। আমরা আশা করি এই মেলার মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে নিরাপত্তা ও মর্যাদার বিষয়টি সবার কাছে আরো বেশি সুস্পষ্ট হবে। রেমিট্যান্স প্রেরকরা আরো বেশি সচেতন হবারও সুযোগ পাবেন, যাতে তারা বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত হন। একইসাথে ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল প্রোভাইডার, অ্যাপ ডেভেলপার, মানি এক্সচেঞ্জ হাউসসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো মেলায় তাদের সেবা প্রদানের সুবিধাগুলো প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।

আশার কথা, অতি সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহ দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বরের মতো চলতি মাস অক্টোবরেও প্রবাসী আয়ের এই ইতিবাচক প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক হিসেবে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোয় প্রবাসীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স পাঠানোর তালিকায় শীর্ষ দেশ এখন যুক্তরাষ্ট্র। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স পাঠানো হয়েছে ৩৯ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসিরা ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশ গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো সংস্কারে আগের চেয়ে বেশি আন্তরিক।

এ ব দিতো থছর মেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স' (১Remittance for Reserve Building and Growth)' যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনেও আমরা আনন্দিত। আমরা মনে করি ২০২৪ সালের ২০ ও ২১ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সম্মানজনক মেলা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশি বিদেশি সকল প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সাথে মেলার আয়োজকদের জানাচ্ছি আবারও কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

(ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ)
চেয়ারম্যান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহের গুরুত্ব অপরিহার্য। দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক রিজার্ভ গড়তে তৈরি পোশাক খাতের পরপরই রেমিট্যান্স-এর কথা উল্লেখ করা হয় বিশেষভাবে। আর তাই সুদূর আটলান্টিক পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে ২০ ও ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'**। এই সম্মানজনক মেলাটির যৌথ আয়োজক বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই), যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক। মেলায় লাল-সবুজের বাংলাদেশকে যথাযথ মর্যাদায় তুলে ধরাই আয়োজকদের অন্যতম লক্ষ্য। এ বছর মেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে : Remittance for Reserve Building and Growth বা রিজার্ভ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স।

'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ৫০ বছর পূর্তিও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** আয়োজন নিঃসন্দেহে আলাদা একটি মাত্রা লাভ করবে।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের গত ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বিদ্যমান বন্ড ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা। এতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারছে ব্যাংকগুলো। প্রণোদনা দিয়ে ব্যাংকগুলো এখন ১২২ টাকায়ও প্রবাসী আয় কিনছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ থেকে অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসীদের আয় বৈধ পথে এলেও বাকিটা অবৈধ পথে বা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসত। ফলে সরকার প্রবাসী আয়ের বিপরীতে বিরাট বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হতো। এদিকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর অর্থ পাচার অনেকটাই কমে গেছে। ফলে প্রবাসীদের মধ্যে বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর পরিমাণও বেড়েছে।

এদিকে গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রবাসী আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একটি দৈনিকের তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসীরা গত অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা প্রায় ২৮ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার সমান (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে)। গত বছরের অক্টোবরে দেশে এসেছিল ১৯৭ কোটি ১৪ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

আমরা আশা করি এই মেলার মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে নিরাপত্তা ও মর্যাদার বিষয়টি সবাইকে আরো বেশি সচেতন করবে। এইসাথে মেলায় ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল প্রোভাইডার, অ্যাপ ডেভেলপার, মানি এক্সচেঞ্জ হাউসসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা প্রদানের সুবিধাগুলো প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে রয়েছে নানা আয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আদায়ে বাংলাদেশের সেরা তিনটি ব্যাংক, সেরা তিনটি রেমিট্যান্স প্রেরক হাউস এবং সেরা দশজন রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি সকল প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। যাদের সহায়তা এই মেলাকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করেছে, তাদের প্রতিও আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। আমরা আশা করছি, এই মেলার আয়োজন বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

(বিশ্বজিত সাহা)

সম্পাদক

বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪

আহ্বায়কের কথা

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** বাংলাদেশের জন্য একটি মূল্যবান বার্তা বহন করছে বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের আগ্রহের শেষ নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পর থেকেই দল মত নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বদেশের জন্য সাধ্যমতো অবদান রেখে চলেছেন। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণে প্রবাসীদের এই উদ্যোগ সমন্বিত ও সুসংহত করা এখন সময়ের দাবি। আর এজন্যই আমরা এবার যুক্তরাষ্ট্রে **'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'** এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আয়োজন করেছি। আর এই আয়োজনকে যৌথভাবে সফল করতে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউইয়র্ক।

সুদূর প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার আদর্শকে সামনে রেখে গত ৩৩ বছর ধরে **মুক্তধারা নিউইয়র্ক** প্রবাসে বইমেলা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে সচ্ছল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন দেশের অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি। দেশের অর্থনীতিকে সুসংহত করতেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। এই কর্মসূচিরই একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' এর আয়োজন। প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিরা বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠালে তা দেশের অর্থনীতির জন্য সহায়ক হয়। এই রেমিট্যান্স দেশের রিজার্ভ গড়তেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরলস চেষ্টায় 'বাংলাদেশ মেরামতে'র যে কর্মসূচি চালু হয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক সংস্কার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সংস্থা এই কাজে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসছেন। এটি যেন অব্যাহত থাকে। আমরা আশা করবো প্রবাসী বাংলাদেশিদের সকলেই এই ব্যপারে সচেতন থাকবেন এবং দেশে অর্থ পাঠানোর জন্য তারা ব্যাংক বা অর্থ প্রেরণকারী বৈধ হাউসের মাধ্যম ব্যবহার করবেন।

(জিয়াউদ্দিন আহমেদ)
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভালোবাসায় আমরা অভিভূত

নতুন বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এগিয়ে এসেছেন প্রিয় রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। ইসলামী ব্যাংকের প্রতি আরও বেশি আস্থা দেখিয়ে তারা রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রেরণ করছেন। রেমিট্যান্স সুবিধাভোগীরাও বড় অংকের টাকা জমা রাখছেন ইসলামী ব্যাংকে। একইসাথে গ্রাহকদের জমার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফিরেছে সোনালী দিনের ধারায়।

দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার মিশনে রেমিট্যান্স যোদ্ধাসহ সকল গ্রাহকদের ভালোবাসায় আমরা কৃতজ্ঞ ও অভিভূত।

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি. | ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Unitrend_IBBPLC/24

যুগ্ম আহ্বায়কের কথা

'বাংলাদেশ রেমিটেন্স মেলা ২০২৪' যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙালিদের জন্য একটা অসাধারণ সুযোগ। এই মেলাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নিজের দেশের উন্নয়নে যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। দেশের কল্যাণে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ থেকেই আমাদের এই মেলার পরিকল্পনা। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক এবং মুক্তধারা নিউইয়র্কের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এই উদ্যোগকে সফল করতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

রেমিট্যান্স মেলার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদেরকে বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করা। কেননা অবৈধ পথে আর্থিক লেনদেন দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এতে প্রকারান্তরে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিবাজরা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আমরা মনে করি, রেমিট্যান্স একটি দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেমিট্যান্সের কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়, যা আমদানি ব্যয় মেটাতে সহায়ক হয় এবং মুদ্রা বিনিময়ের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এজন্য আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্যতম এই স্তম্ভকে আরো শক্তিশালী করতে সংশ্লিষ্ট নানা খাতের সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি এবং সফল হয়েছি।

বাংলাদেশের বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার 'বাংলাদেশ মেরামতে'র জন্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, সেখানে অর্থনৈতিক দিকটি সর্বোচ্চ ও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি প্রত্যাশা করি। আশা করি প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবিষয়ে সচেতন হবেন।

মেলায় যেসব দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষী অংশগ্রহণ করে মেলাকে সফল করেছেন তাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা।

R Chowdhury

(রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী)
যুগ্ম আহবায়ক
বাংলাদেশ রেমিটেন্স ফেয়ার ২০২৪

Bangladesh Remittance Fair 2024

Bangladesh Remittance Fair 2024

AWARD

Top Remittance Receiver Bank Award 2024

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি | ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

Bank Asia

Top Remittance Channel Partner Award 2024

sunmanexpress
global money transfer

Standard Express
A Subsidiary of Standard Bank Limited, Bangladesh
Licensed as a Money Transmitter by the NYS Banking Department

BA Express

Top Individual Remitter Award 2024

1. Farid Ahmed
2. Raynal Alam
3. Mohammed Solaiman
4. Karim Ullah
5. Md. M. Rahman
6. Shah M. Nawaz
7. M. Sharif Hossin
8. Raihanul Islam Chowdhury
9. Mohiuddin Siam
10. Subhechha Mondol

www.bangladeshremittancefair.com

Dhaka Bank Crowned
A Prestigious Global Recognition
by Asian Development Bank

Appreciation of Excellence

Dhaka Bank is recognized as the Leading Partner Bank in Bangladesh by Asian Development Bank in the 10th Trade and Supply Chain Awards 2024. It's a proud global accolade for Dhaka Bank PLC. This is an inspiration for us to continue delivering excellence as one of the best banks of the country.

DHAKA BANK PLC.

www.dhakabankltd.com

ইসলামী ব্যাংক ১৮ বছর ধরে দেশের শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক। ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় দেশে আনয়নে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

গত ১৮ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংক প্রবাসী রেমিট্যান্স আহরণে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে এ ব্যাংক দেশের মোট রেমিট্যান্সের ৩০% আহরণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ইসলামী ব্যাংক ৬.১৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী রেমিট্যান্স দেশে আনে, যা দেশের জিডিপি'র ১.৩৪ শতাংশের সমপরিমাণ। ২০২৪ সালে (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) দেশের সংগৃহীত রেমিট্যান্সের ২৩.৪৮% ইসলামী ব্যাংক এককভাবে আহরণ করেছে।

আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংক সেলফিন অ্যাপ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এমক্যাশসহ অনেক ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেল ও সেবা চালু করেছে যার মাধ্যমে সহজেই রেমিট্যান্সের অর্থ গ্রহণ করা যায়।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ প্রবাসী রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে ৭ম স্থানে। বিশ্বজুড়ে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ প্রবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ পথে বাংলাদেশে আনয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদানের জন্য সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে ব্যাংকের মোট ৩১ জন প্রতিনিধি কর্মরত রয়েছেন।

- ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত ১৫ বছরে ইসলামী ব্যাংক ৬০.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রবাসী রেমিট্যান্স দেশে এনেছে।
- ২০২৪ সালে দেশের আহরিত মোট রেমিট্যান্সের ২৩.৪৮% এককভাবে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আহরিত হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশে আগত মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৯.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে শুধু ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আহরিত হয়েছে ৪.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সুবিধার্থে ইসলামী ব্যাংক ২৪/৭ রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করছে।
- পৃথিবীর ২২টি দেশের ১৫৬টি ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স চুক্তি রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল:

দেশ	দেশে আগত মোট রেমিট্যান্স		**ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আগত** রেমিট্যান্স		জাতীয় রেমিট্যান্সে **ইসলামী ব্যাংকের** অংশীদারত্ব
	মার্কিন ডলার (মিলিয়ন)	শতাংশ	মার্কিন ডলার (মিলিয়ন)	শতাংশ	
যুক্তরাষ্ট্র	২,৭৫৬.৫৩	১৪.০২%	৬৬৮.০১	১৪.৪৮%	২৪.২৩%

সাল	দেশে আগত মোট রেমিট্যান্স (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	**ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আগত** রেমিট্যান্স (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০২০	২,৬৭০.৬৩	**১,৩০৮.৫৯**
২০২১	২৮৭৯.১৯	**১,৭১২.৫০**
২০২২	৩,৭১২.৬৮	**৯৮৪.৮০**
২০২৩	২,৬৮১.০৭	**৩৯২.১৯**
২০২৪ (জানু-সেপ্টে.)	২,৭৫৬.৫৩	৬৬৮.০১

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে করণীয়

১. বাংলাদেশিদের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ।

২. যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সংযোগ স্থাপন।

৩.ন্যূনতম সময়ের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রাপকের হিসাবে জমার ব্যবস্থা করা।

৪. বড় অংকের রেমিট্যান্স দেশে প্রেরণ উৎসাহিত করা এবং বিশেষ বিনিময় হার প্রদান।

৫. প্রবাসীদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চালু রাখা, জনমানুষের জীবনমানের আর্থিক নিরাপত্তা সাধন, প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক সেবার পরিধি বিস্তারে গত ৪১ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের শ্রমে ঘামে অর্জিত ইসলামী ব্যাংকের সফলতা জাতীয়ভাবে ব্যাংকের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সামনের দিনগুলিতেও জাতীয় উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকের কর্ম সম্পাদন অব্যাহত থাকবে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাওয়া নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রবাসীদের অব্যাহত সহযোগিতা সকলের প্রত্যাশা।

লেখক: চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

রিজার্ভ গঠন ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স

শেখ মোহাম্মদ মারুফ

বিগত কয়েক দশক ধরে, রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অবিচ্ছেদ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। এটি শুধু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, বরং দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ যখন জাতিসংঘে তার ৫০ বছরের সদস্যপদ উদ্‌যাপন করছে, তখন বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪-এর প্রতিপাদ্য, 'রিজার্ভ গঠন ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স,' ভবিষ্যত সমৃদ্ধির পথ নির্দেশনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রতিপাদ্য রেমিট্যান্সের বহুমুখী প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে শুধুমাত্র রিজার্ভ বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করে, বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নে এর গুরুত্ব তুলে ধরে। রেমিট্যান্সকে কেবল পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের বাহন হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং একটি সুসংহত কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, যা আনুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে, ডিজিটাল উদ্ভাবনের প্রসার ঘটাবে এবং আর্থিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। এর মাধ্যমে প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, যা রেমিট্যান্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'-এর মূল উদ্দেশ্যই হলো এ সম্ভাবনা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা। এ লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে 'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪'। দেশের প্রবাসীরা যেন নিজেদের মাতৃভূমির উন্নয়নে যুক্ত হতে সক্ষম হন এবং অবদানের জন্য যথাযথ মূল্যায়িত ও স্বীকৃত বোধ করেন, এ মেলা সেই পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ দেশের জনগণ, দেশ বা বিদেশে থাকুক, তাদের নিবেদিত পরিশ্রমের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরও নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করার পথে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পারি।

বাংলাদেশের জন্য রেমিট্যান্সের গুরুত্ব

রেমিট্যান্স বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস, যা বছরে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব যোগান দেয়। এটি রপ্তানি আয়ের পরেই অবস্থান করছে। ধারাবাহিক এই অর্থপ্রবাহ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করে, যা আমদানি ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা, মুদ্রা স্থিতিশীল রাখা এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পূরণে সহায়তা করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বা আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

রেমিট্যান্স কেবল রিজার্ভ বাড়াতেই সাহায্য করে না, এটি আরও বৃহৎ প্রভাব রাখে। রেমিট্যান্স সঠিকভাবে পরিচালিত হলে, তা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। আর্থিক নীতির সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ হলে, তা দেশের দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। এই লক্ষ্যে আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে পারব এবং বৈশ্বিক প্রবাসী সম্প্রদায়ের অবদানকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ভূমিকা

গত এক দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অভিবাসন প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সরকারের অনুকূল নীতিমালা এই প্রবাহের পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষ দেশগুলোর একটি। ২০১০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশে এসেছে। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এমনকি কোভিড-১৯ মহামারির বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল স্থিতিশীল। ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালেও এই প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশে আসে। ২০২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের ৪৭ দশমিক ২৭ শতাংশ এসেছে জিসিসি দেশগুলো (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান ও বাহরাইন) থেকে, ইউরোপের দেশ: যুক্তরাজ্য ও ইতালির সম্মিলিতভাবে অবদান ১৫ দশমিক ৫০ শতাংশ আর ১২ দশমিক ৮৮ শতাংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এটি সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল রেমিট্যান্স প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের প্রসার এবং প্রবাসীদের পক্ষ থেকে দৃঢ় আর্থিক সহযোগিতার কারণে।

রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির কৌশল

১. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উন্নত করা: ডিজিটাল রেমিট্যান্স পরিষেবা উন্নত করা প্রেরণ প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত সরল এবং নিরাপদ করে তুলতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক এবং ফিনটেক কোম্পানির মধ্যে সহযোগিতা সুসংগঠিত করতে হবে।

২. লেনদেন খরচ কমানো: ফি কমানো প্রবাসীদের আনুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে পারে।

৩. আর্থিক প্রণোদনা প্রদান: অগ্রাধিকারমূলক বিনিময় হার এবং রেমিট্যান্স সম্পর্কিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুযোগের মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন উচ্চতর প্রবাহ উৎসাহিত করতে পারে।

৪. সামাজিক সুবিধা যুক্ত করা: সরকারি আবাসন প্রকল্প, ভূমি প্রকল্পে অগ্রাধিকার, কর ছাড় সুবিধা, দ্রুত পাসপোর্ট এবং এনআইডি প্রক্রিয়াকরণ, পরিবারের সদস্যদের দ্রুত ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

৫. সহযোগিতা শক্তিশালী করা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুললে আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া আরও সহজলভ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

'বাংলাদেশ রেমিট্যান্স মেলা ২০২৪' রেমিট্যান্সের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। প্রবাসীরা যখন তাদের অবদানের জন্য যথাযথ মূল্যায়িত ও স্বীকৃত বোধ করেন এবং সরকারের সহায়তায় মাতৃভূমির উন্নয়নে যুক্ত হতে সক্ষম হন, তখনই আমরা একটি টেকসই ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

রেমিট্যান্স কেবলমাত্র রিজার্ভ বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার নয়; এটি তৃণমূল অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি, যা কার্যকর কৌশল ও নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে তুলতে সক্ষম।

লেখক: *ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি*

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ পিএলসি.

ভ্রমণ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা এক্সিম ব্যাংকের RFCD অ্যাকাউন্টে জমা করলেই সর্বোচ্চ ৬.৮৫% মুনাফা

সুবিধাসমূহ:

- যেকোনো সময়, যেকোনো পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ডিপোজিট সুবিধা
- আনলিমিটেড অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স মেইনটেইন করার সুযোগ
- বিদেশ ভ্রমণের সময় ৫,০০০ ডলার পর্যন্ত ক্যাশ নেয়ার সুবিধা
- ডলার/পাউন্ড/চাইনিজ ইউয়ান ও ইউরো ডিপোজিট সুবিধা
- প্রতি পরিবারে সর্বোচ্চ ২টি সাপ্লিমেন্টারি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা
- ৩০০ ডলারের ওপরে অনলাইন ট্রানজ্যাকশন করার সুযোগ

সব ধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

www.eximbankbd.com

রেমিট্যান্স বাড়ছে না কেন

ড. বিরূপাক্ষ পাল

আংশিক হিসাব বলছে, চলতি নভেম্বর মাসে পৌনে ২ বিলিয়ন ডলারের একটু বেশি রেমিট্যান্স পাওয়া যাবে। তাতে বছরে ২১-২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি জুটবে না, যা বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের অবক্ষয় ঠেকাতে পর্যাপ্ত নয়।

মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওই হুন্ডির টাকাটা ফরমাল প্রণালিতে অর্থাৎ হিসাবি ধারায় টেনে আনা, পুলিশ দিয়ে বা গোয়েন্দা দিয়ে নয়।

হুন্ডি বা কালোবাজার যখন প্রকট হয়, তখন রাজনীতিকদের উচিত পুলিশের কাছে না গিয়ে অর্থনীতিবিদের কাছে আসা।

গভর্নরের কাজ হবে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আড়াই ভাগ প্রণোদনা বিতাড়িত করে সেটি বিনিময় হারের ন্যায্য হিসাবের সঙ্গে যুক্ত করা।

আমার শিশুকন্যার অসুস্থতার কারণে বাড়ি থেকে শতাধিক মাইল দূরে রচেস্টার নামক শহরে থাকতে হয়েছিল মাসখানেক। হাসপাতালের পশ্চিমা খাবারে রুচি হারিয়ে অগত্যা এক ভারতীয় দোকান খুঁজে বের করি। ওই দোকানের কয়েকটি জায়গায় চোখে পড়ল ভারতে মুদ্রা প্রেরণের বিজ্ঞাপন। কীভাবে কত দ্রুত মার্কিন ডলার চলতি বাজারমূল্যে ভারতের যেকোনো জায়গায় পাঠানো যায় তার আকর্ষণীয় আমন্ত্রণ।

ব্যাপারটা প্রযুক্তির ভাষায় ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, যা করতে প্রয়োজন ল্যাপটপ, কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে কয়েকটা খোঁচা বা ক্লিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই টাকা জমা হয়ে যাবে রেমিট্যান্স গ্রহীতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। কয়েকটা অ্যাপস দাবি করছে, ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে দেবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে গর্বিত হওয়ার পরও আমরা যে সেখানে এখনো পৌঁছুতে পারিনি, প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স না বাড়ার এটা প্রধান কারণ।

চলতি নভেম্বর মাসের আংশিক হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে, এ মাসে পৌনে ২ বিলিয়ন ডলারের (পৌনে ২০০ কোটি ডলার) একটু বেশি রেমিট্যান্স পাওয়া যাবে। তাতে বছরে ২১ থেকে ২২ বিলিয়ন (এক বিলিয়নে ১০০ কোটি) ডলারের বেশি জুটবে না। এটি বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের অবক্ষয় ঠেকাতে পর্যাপ্ত নয়, যা এখন নিট হিসাবে প্রায় ২৬ বিলিয়ন (২ হাজার ৬০০ কোটি) ডলারে ঠেকেছে।

এ মজুত মাত্র সোয়া তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারে। স্বস্তির জন্য প্রায় ছয় মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহের মজুত থাকা

দরকার। সেই লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৫০ কোটি ডলার) দেশে প্রবাহিত হওয়া উচিত। পৌনে ২ বিলিয়নকে আড়াই বিলিয়নে টেনে তোলা খুব কঠিন কাজ নয়।

আসলে আড়াই বিলিয়ন প্রতি মাসে ঠিকই আসছে। কিন্তু ইনফরমাল বা হুন্ডি চ্যানেলে পৌনে ২ বিলিয়নের বাড়তি যে টাকাটা দেশে প্রবেশ করে, সেটি তো আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে জমা পড়ে না। তাই মুদ্রার মজুত কমতেই থাকে এবং অর্থনীতি বিপদের কালো মেঘ দেখতে পায়।

কেন হুন্ডি

মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওই হুন্ডির টাকাটা ফরমাল প্রণালিতে অর্থাৎ হিসাবী ধারায় টেনে আনা। পুলিশ দিয়ে বা গোয়েন্দা দিয়ে নয়। চটপটে নীতি দিয়ে। দ্রুত প্রযুক্তি খাটিয়ে। যোগ্য বিনিময় হার বজায় রেখে। সর্বোপরি রেমিট্যান্স প্রেরক কিংবা গ্রহীতাকে নানা ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না ফেলে। আঙুলের দাগ গুনে দেখানো যাবে যে এর প্রত্যেক জায়গায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যর্থতা আছে এবং তা এখনো চলছে। এর ওপর যুক্ত হয়েছে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অ-বাজারীয় নীতি গোঁয়ার্তুমি, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও অথর্ব বানিয়ে এর সমস্যাকে দিন দিন প্রকট করে দিচ্ছে।

হুন্ডি বা কালোবাজার যখন প্রকট হয়, তখন রাজনীতিকদের উচিত পুলিশের কাছে না গিয়ে অর্থনীতিবিদের কাছে আসা। হার্ভার্ডের অধ্যাপক গ্রেগরি ম্যাংকিউ তাঁর লেখা অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ে দেখিয়েছেন যে ভ্রান্ত মূল্য নির্ধারণ থেকে কালোবাজারের উৎপত্তি হয়। কোনো কিছুর সঠিক চাহিদা না বুঝে তার কম মূল্য নির্ধারণ করা অথবা ওই বস্তুর কম জোগান দেওয়া এ দুই কারণে চোরাপথ বা চোরাদামের সৃষ্টি হয়। হুন্ডির বেলায়ও তা সত্যি। ডলারের অপেক্ষাকৃত ভালো দাম পায় বলেই লোকে হুন্ডির পথে যায়। আরও পায় দ্রুততম সময়ে টাকা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, যা বারবার নীতি নির্ধারকেরা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং নানা ভাষায় হুন্ডিতে জড়িত ব্যক্তিদের ধমকাচ্ছেন। এ ধমকের একাংশও যদি মুদ্রা পাচারকারী বা খেলাপিদের কানে পৌঁছানো যেত, তবে তা হতো অধিক মঙ্গলকর।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতেও কালোবাজারে টিকিট বিক্রি হয়। তখন অর্থনীতিবিদেরা অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে ওই টিকিটের মূল্য নির্ধারণে গন্ডগোল আছে। এ জন্য কালোবাজারকে সঠিক দামে পৌঁছানোর এক বাজারীয় ইঙ্গিত বলে ধরা হয়। প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রধান অর্থ উপদেষ্টা অ্যালান ক্রুগার বলেন, দাম কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখলে দ্বিতীয় বাজারের উৎপত্তি হবেই। ডলারের দাম কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রেখেও সম্প্রতি হুন্ডির রমরমা ব্যবসার পথ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ লাগিয়েও কাজ হচ্ছে না। অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম পিটারসন মনে করেন, কালোবাজার হচ্ছে প্রচলিত বাজার দুর্বলতায় গড়ে ওঠা এক বিনিময় পন্থা, যা সময় বাঁচিয়ে মানুষের পয়সা নেয়। তিনি প্রশ্ন করেন, সরকার এদের বিপক্ষ নেয় কেন। জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ট্রেসি মিলার মনে করেন, কালোবাজারি ত্রুটিপূর্ণ দামের সংশোধন ঘটায় বলে এটি কোনো জালিয়াতি নয়। কংগ্রেসম্যান চাক শুমার কালোবাজারিদের সফটওয়্যার বন্ধে আইনের প্রস্তাব করলে অধ্যাপক মিলার একে অপ্রয়োজনীয় বলে আখ্যায়িত করেন। ক্ষমতাবান রাজনীতিকের বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদেরা এ রকম উচ্চবাক হলে আমাদের সমাজে বিপদে পড়ে যেতেন।

আমাদের নীতিনির্ধারকেরা হুন্ডিকে নীতি ত্রুটির পার্শ্বফল হিসেবে মেনে নিয়ে হুন্ডির গুণগুলো আহরণের চেষ্টা করলে বেশি উপকার হতো। এতে হুন্ডির ব্যাপক কার্যক্রম দুর্বল বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ত। শুধু পুলিশের ওপর ভরসা করা এক নির্বুদ্ধিতা। গোয়েন্দা বা পুলিশের তো আরও কাজ আছে। হুন্ডির পেছনে তাদের সময় ও কার্যদক্ষতা ব্যয় করলে দাগি আসামি ও জঙ্গিরা বড়ই আনন্দিত হবে। তবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের অর্থায়নে হুন্ডির ব্যবহারকে ধরা অবশ্যই পুলিশের কাজ।

কিন্তু ব্যাংকের অদক্ষতা ও ভ্রান্ত দাম নির্ধারণের ফলে যে হুন্ডিচক্র রেমিট্যান্সের মধ্যে ভাগ বসাচ্ছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দ্বাদশ শতকে হুন্ডি ভারতে প্রবেশ করে। ব্রিটিশরাও এর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বরং হুন্ডির মাধ্যমে সৃষ্ট 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'-কে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে অনেক লেনদেনের বেলায়। কারণ, তারা এর পেছনের অর্থনীতি বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পারছি না আমরা। তাই ভাবছি পুলিশ দাবড়িয়ে একে বাগে আনা যাবে।

রেমিট্যান্স বাড়তে পারে যেভাবে

২০০ বছর আগে অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে 'তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব' দিয়ে গেছেন, আজ হুন্ডির বেলায়ও সেটি কার্যকর। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বাণিজ্য দুই পক্ষকেই অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে নিয়ে যায়। তা না হলে বাণিজ্য হতো না। হুন্ডির সেবাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যেও এরূপ একটা অলিখিত 'প্রেমচুক্তি' বিদ্যমান। আমাদের ব্যাংকাররা যদি এই প্রেমচুক্তির বিকল্প সুবিধা দিতে পারেন, তাহলে হুন্ডিওয়ালারা ক্রমান্বয়ে 'ডাইনোসর' হয়ে যাবে। কিংবা বেঁচে থাকলেও অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হিসেবে টুকটাক ব্যবসা করবে, শুধু কাগজপত্রহীন প্রবাসী শ্রমিকদের অন্নপুষ্ট হয়ে।

হুন্ডিওয়ালাদের তুলনামূলক অগ্রসরতা তিন জায়গায়: ১. ওরা দ্রুত টাকা পৌঁছে দেয় ২. বিদেশি মুদ্রা বা ডলারের বাজারভিত্তিক ভালো

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য সু-খবর!!!

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধভাবে দ্রুত ও নিরাপদে দেশে পৌঁছে দিচ্ছে সরকারী মালিকানাধীন ... অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.

- বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী চাকুরী প্রার্থীদের জন্য ঋণ
- বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ঋণ
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর ৯৭৮টি শাখায় প্রেরিত রেমিট্যান্স তাৎক্ষনিক পাওয়া যায়।
- বিশ্বখ্যাত Money Transfer Company যেমন- Western Union, MoneyGram, XpressMoney, RIA, Transfast (Mastercard), Merchantrade, Prabhu, NEC Money ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর সকল শাখা থেকে মিনিটেই উঠানো যায়।
- bkash, Nagad Mobile Wallet সহ Buro Bangladesh এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স সেবা দেওয়া হয়।
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর এক্সচেঞ্জ হাউজ হতে প্রেরিত টাকা অগ্রণী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে তাৎক্ষনিকভাবে নগদ গ্রহন ও একাউন্টে জমা করা যায়।
- অগ্রণী ব্যাংকের মালিকানাধীন যে কোন এক্সচেঞ্জ হাউজ থেকে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ইউ এস ডলার বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ক্রয় ও ভাঙ্গানো যায়।
- অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর যে কোন শাখায় বিদেশ থেকে প্রবাসী সঞ্চয়ী হিসাব, মেয়াদী আমানত হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে।
- অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংকের যে কোন শাখায় BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের একাউন্টে টাকা জমা করা যায়।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
Committed to serve the nation

Website : www.agranibank.org
info_frd@agranibank.org
Tel: 02223383942

দাম দেয়, এবং ৩. ওদের নেটওয়ার্ক গ্রাম-গঞ্জের প্রায় সর্বত্র। রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য এই তিন গুণ অর্জন মোটেই দুঃসাধ্য নয়। শুধু চাই সদিচ্ছা, আধুনিক প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কিছু পদক্ষেপ। তৃতীয় ধারায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা ধন্যবাদের দাবিদার। এর নেতৃত্বেও আজ 'এজেন্ট ব্যাংকিং'-এর গ্রাহক প্রায় ১৭ লাখ।

সম্প্রতি দেখা গেছে যে অজস্র এজেন্ট ব্যাংক গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণে এক বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকের সম্প্রসারণকে একটা বিপ্লবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। গভর্নর আতিউর রহমানের সময় তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু জয়দেবপুরের এক গ্রামে গিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিং দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এর সম্প্রসারণের সুপারিশ করে গেছেন।

সমস্যা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় গুণের ক্ষেত্রে ব্যাংক হুন্ডিওয়ালাদের চেয়ে পেছনে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও আন্তরিক হতে হবে। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সাম্প্রতিক কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে তাঁর পক্ষে ডলারের ন্যায্য দাম ও দ্রুত নিশ্চিতকরণ এই দুটো জায়গায় পরিবর্তন আনা কঠিন হবে না। একটা সংকটের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করলেও গভর্নরকে বেশ গতিশীল বলেই মনে হচ্ছে। আগের নেতৃত্বের সময় আমরা নড়াচড়া দেখিনি একমাত্র ব্যবসায়ীদের চাপ ছাড়া। ব্যাংকের ভেতরেও প্রাক্-ব্রিটিশ মানসিকতার উপদেষ্টাদের দাপট ছিল। সর্বদা মন্ত্রণালয়কে সন্তুষ্ট করার কসরত ছিল প্রবল।

তারই ফলে টাকার অতিমূল্যায়ন অ-বাজারীয়ভাবে ধরে রাখা হয়েছিল অর্ধযুগ, যার ফলে আজ টাকার মানে ধস, চলতি হিসাবে ঘাটতি এবং শেষতক বিদেশি মুদ্রার মজুতে দ্রুত অবক্ষয়। সম্প্রতি নতুন গভর্নর রেমিট্যান্সের সব ফি বাতিল করেছেন। কয়েক দফা বাজারীয় দামের কাছাকাছি ডলারের দাম তুলেছেন। আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ এনেছেন। কিন্তু পত্রিকার রিপোর্টমতে, হুন্ডিতে ডলারের দাম এখনো ব্যাংক প্রদত্ত ১০৭ টাকার চেয়ে ৫-৬ টাকা বেশি। এটি খেটে খাওয়া প্রবাসী শ্রমিক তো বটেই, যেকোনো মানুষের কাছে এখনো বড় ব্যবধান। হুন্ডিকে দুর্বল করতে হলে 'ফুটপাত দাম'-এর কাছাকাছি যেতে হবে। তা না করে চিলের পেছনে কানের জন্য ধাওয়া করে কাজ হবে না। আপাতত মুদ্রা মজুতের ভীতিকর ক্ষয় ঠেকাতে হলে এ পথে হাঁটতেই হবে।

গভর্নরের পরবর্তী কাজ হবে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেই আড়াই ভাগ প্রণোদনা বিতাড়িত করে সেটি বিনিময় হারের ন্যায্য হিসাবের সঙ্গে যুক্ত করা। ব্যাংক দিচ্ছে ১ ডলারে ১০৭ টাকা। এর সঙ্গে আড়াই ভাগ ভর্তুকি যুক্ত হলে ডলারের কার্যকর দাম দাঁড়ায় ১০৯ দশমিক ৬৭৫ টাকা। মন্ত্রণালয়ের কর্তারা কি সব রেমিট্যান্স প্রেরক ও গ্রহীতাকে ফাইন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিংয়ের ছাত্র ভাবেন? মানুষের তো এত সময় নেই যে ক্যালকুলেটর হাতে নিয়ে সারাক্ষণ 'ইফেক্টিভ রেট' হিসাব করবে এবং তারপর হুন্ডি রেটের সঙ্গে তুলনা করবে।

এ প্রণোদনা নামক বস্তুটি আদৌ কোনো প্রণোদনার কাজ করেছে কি না, তার কোনো জরিপ বা গবেষণা নেই। সবটাই মনগড়া। ঠিক একইভাবে 'প্রণোদনা দিলে পাচার হওয়া অর্থ ফিরে আসবে'-এ মনগড়া তত্ত্বে ভর করে বাজেটে ছাড় দেওয়া হলো। কিন্তু এক টাকাও ফিরে এল না। মাঝখান থেকে মুদ্রা পাচারকারীকে দেওয়া হলো বৈধতার রাজসম্মান আর নবাগত পাচারকারী উৎপাদনের সূক্ষ্ম প্রণোদনা। নীতি প্রণয়নের একটা আদর্শিক মাপকাঠি থাকা উচিত। এটা অ্যাডাম স্মিথসহ সব বাজারবাদী অর্থনীতিবিদও জোর দিয়ে বলেছেন।

এরপর গভর্নরের কাজ হবে দ্রুততম রেমিট্যান্সের জন্য প্রতিটি এক্সচেঞ্জ হাউসকে বিভিন্ন 'অ্যাপস' প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করা। কিছু কিছু অ্যাপস মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে রেমিট্যান্স পাঠায় এবং এগুলো আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত। আজ থেকে ২০ বছর আগে আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে কম্পিউটারে মাত্র কয়েকটা ক্লিক করে আমার যৎসামান্য সঞ্চয় আমেরিকায় পাঠিয়েছিলাম।

এখন আমি বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 'ডাক হরকরা' গল্পের স্টাইলে। মনে হয় কবি সুকান্তের 'রানার' আমার ডলার নিয়ে ঢাকায় পৌঁছে দেয়। ফরম পূরণ করি, চেকের পাতা খরচ করি, খামে ভরে টিকিট লাগাই, সময় করে চিঠি বাক্সে ফেলি।

তার ছয়-সাত দিন পর বাংলাদেশে ফোন করে জানতে পারি টাকা জমা হয়েছে। কী শান্তি! পাশের সহকর্মীকে দেখি মেক্সিকোতে টাকা পাঠান কয়েকটা ক্লিক করে। যদি তিনি জানতে চান আমাদেরটা এত দেরি হয় কেন, আমি বলি আমাদের দেশে নিরাপত্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতি উন্নত। তাই এত দেরি হয়। মাত্র তিন জায়গা দ্রুতি, নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি ও সর্বোপরি ডলারের বাজারতুল্য ন্যায্য দাম নিশ্চিত করলে রেমিট্যান্স না বেড়ে উপায় নেই।

লেখক:
যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ডে অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ

মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যয় হোক প্রবাসী আয়

ফারুক মঈনউদ্দীন

বেশ কয়েক বছর আগে সিলেটের এক ব্যাংক ম্যানেজার লন্ডনে গিয়েছিলেন সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তার একটি বাক্যেই প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের জীবনযাপনের একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, সেখানকার বাংলাদেশিরা কী অবস্থায় কাজ করে টাকা রোজগার করেন, তা নিজ চোখে দেখলে দেশে থাকা তাঁদের পরিবারের লোকজনের সে টাকা যথেচ্ছ খরচ করতে মন চাইবে না। এ রকম মানবেতর পরিবেশ মেনে নিয়েও নিম্ন আয়ের দেশ থেকে ভাগ্যান্বেষী মানুষের দেশান্তরি হওয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। স্বাধীনতার পর বিদেশে ভাগ্যান্বেষী বাংলাদেশি মানুষের জন্য একটা নতুন দরজা খুলে যায় মধ্যপ্রাচ্য ও আরব। সত্তর দশকের প্রথম দিকে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হলে সেখানে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা তৈরি হয়। ফলে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় সেসব দেশে। এখনো আরব বিশ্বেই বাংলাদেশি শ্রমিকের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা কোরিয়ার মতো কিছু নব-শিল্পায়িত দেশেও অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশি জনশক্তির একটা ছোট অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এসব দেশে পাড়ড় জমানোর সুযোগ পায়।

পৃথিবীর দেশে দেশে বাংলাদেশি জনশক্তির এই উপস্থিতির দুটো শ্রেণি আছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রধান এবং বৃহত্তম অংশটি স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ, যাঁরা সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশে যান জনশক্তি সরবরাহকারী ঠিকাদারদের মাধ্যমে। দেশের শ্রমবাজারে যোগ্য কোনো ধরনের কাজ না পেয়ে যেকোনো শর্তে বিদেশে পাড়ি জমানো এই জনশক্তির বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের কিংবা কর্মহীন মানুষ। অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে ধরা পড়া এসব মরিয়া মানুষের খবর মাঝে মাঝে জানা গেলেও যাঁরা সফলভাবে পাড়ি দিতে পারেন, তাঁদের কোনো খতিয়ান নেই কারও কাছে। এদের মূল কর্মস্থল হয় মধ্যপ্রাচ্য, সৌদি আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে। অন্য অংশটি কর্মরত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশে।

এই জনগোষ্ঠীর একাংশ আবার উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ, যেমন: চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি। প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অংশটির দেশত্যাগ দীর্ঘমেয়াদি কখনো বা স্থায়ীভাবে। এদের একাংশ ছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশত্যাগী

শিক্ষার্থী ছাত্র ও শিক্ষক। অপর অংশটি স্বল্প দক্ষ কিংবা অদক্ষ শ্রেণির, যাদের প্রায়ই আবিষ্কার করা যায় বিদেশের বিমানবন্দর, শপিং মল কিংবা ফুটপাতের ধারের অস্থায়ী দোকানে।

ওপরের দুটি প্রধান শ্রেণির মধ্যে অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ এবং অর্ধশিক্ষিত যে শ্রেণিটি বিদেশে যায়, তাদের সংখ্যা বিশাল, মোট ৮৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৫৩ লাখই (৬১ দশমিক ৬ শতাংশ) এসএসসির সিঁড়ি টপকাতে পারেননি (সূত্র: প্রথম আলো, ৩ আগস্ট ২০১৪)। অথচ এই শ্রেণির মাধ্যমেই আসে আমাদের রেমিট্যান্স আয়ের সিংহভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমাদের মোট বার্ষিক রেমিট্যান্স এক হাজার ৪৪৬ কোটি ডলারের ৬৩ শতাংশ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। অবশ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত এই পরিমাণ কমে হয়েছে এক হাজার ৪২২ কোটি ডলার। আর মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব বিশ্বের অবদান কমে ৫৯ শতাংশ হলেও অবদান বিচারে এই শ্রেণিটির গুরুত্ব কমেনি। এখানে উল্লেখ্য, ভারতে বার্ষিক রেমিট্যান্স আসে সাত হাজার কোটি ডলারের বেশি আর পাকিস্তানে আসে এক হাজার ৪০০ কোটি ডলারের মতো।

যেসব দেশ থেকে আমাদের রেমিট্যান্স আসে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী-আয়ের স্থানটি সৌদি আরবের, তার পরের স্থানগুলো দখল করে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যে যে কেবল অদক্ষ শ্রমিকেরাই কাজ করেন তা নয়, তাই মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে অন্যান্য দেশের অদক্ষ শ্রমিকদের আয় যোগ করলে অদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত প্রবাসীদের অবদানের চিত্র প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। এই শ্রেণির কর্মীবাহিনীর ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ কম হলেও মোট

রেমিট্যান্সে তাদের পাঠানো অর্থের অবদান বেশি হওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে। প্রথমত, তাদের সংখ্যা বেশি, দ্বিতীয়ত, যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে এই শ্রেণিটি কখনো সর্বস্ব উজাড় করে, কখনো ঋণ করে দেশান্তরি হয়, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, যত দ্রুত সম্ভব সেই টাকা রোজগার করে দেশে ফেরত পাঠানো। ফলে তারা কোনো ধরনের অপচয় না করে আয়ের প্রায় পুরো টাকাটাই দেশে পাঠানোর চেষ্টা করে। এই প্রয়াসে অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকেরা যে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন বিদেশে, তার সাক্ষ্য মেলে শুরুতেই উদ্ধৃত ব্যাংক ম্যানেজারের জবানিতে।

প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির পাঠানো রেমিট্যান্সের যে প্রবণতা আমরা লক্ষ করি, তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের উচ্চশিক্ষিত যাঁরা বিদেশে কর্মরত এবং যাঁরা স্থায়ীভাবে অভিবাসী হয়ে যান, তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স অদক্ষ ও অর্ধশিক্ষিত শ্রমশক্তির অবদানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কারণ, সচ্ছল পরিবার থেকে গেলে কিংবা সপরিবারে অভিবাসী হলে তাঁদের আর দেশে টাকা পাঠানোর প্রয়োজন ও গরজ থাকে না।

সুতরাং আমাদের রেমিট্যান্স আয়ের মূল প্রবাহটি সচল রেখেছেন আমাদের অদক্ষ ও অর্ধশিক্ষিত প্রবাসীরাই। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এই রেমিট্যান্সের কিছু নিয়ামক নির্ণীত হয়েছে ২০০৯ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায়। এতে দেখানো হয়েছে, প্রত্যেক প্রবাসী শ্রমিক বার্ষিক ৮১৬ ডলার রেমিট্যান্স পাঠান দেশে। অবশ্য প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রত্যেক পরিবার তাদের প্রবাসী নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার ৫০০ ডলার প্রবাসী-আয় অর্জন করে। এতে অবশ্য শ্রমিকপ্রতি প্রবাসী-আয়ের হিসাব নেই। প্রথমোক্ত সমীক্ষায় আরও দেখানো হয়েছে, তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের রেমিট্যান্স আয় বাড়ে, যার পরিমাণ প্রতি ডলারের জন্য বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি ডলার। আবার ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়নও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, যার পরিমাণ প্রতি এক টাকা অবমূল্যায়নের জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ ডলার।

আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসী-আয়ের অবদান মোট জিডিপির দশ শতাংশের মতো। এই আয় ব্যয়িত হওয়ার খাতওয়ারি হিসাবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে (সূত্র: প্রথম আলো, ৩ আগস্ট ২০১৪) আমাদের প্রবাসী-আয়ের ৭৮ শতাংশ যায় খাদ্য (৩৯ শতাংশ), বস্ত্র, শিক্ষা, যাতায়াত (৩৯ শতাংশ) ইত্যাদি খাতে। বাকি ১৭ শতাংশ খরচ হয় জমি বা বাসস্থানে এবং ৫ শতাংশ যায় বিলাসদ্রব্যে। আলোচ্য সমীক্ষার ফলাফলে আবিষ্কৃত হয় প্রবাসী-আয়ের তিন-চতুর্থাংশই ভোগ হয়ে যায়, অর্থাৎ কোনো উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয় না।

ওপরে আমাদের দেশের দেশান্তরি শ্রমশক্তির যে শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়, তাতে প্রবাসী-আয় ব্যবহারের এই প্রবণতা যুক্তিগ্রাহ্য। এমনকি বিলাসদ্রব্য আহরণ কিংবা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থেরও কিছু মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা আছে। এই আয় ভোগ্যপণ্যে অপচয় না হয়ে সরাসরি বিনিয়োগে ব্যবহৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু যেকোনো ব্যয়ই যে অর্থনীতির উৎপাদনচক্রের গতিতে বাড়তি শক্তি জোগায়, তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি ভোগ্যপণ্যে ব্যবহারেরও রয়েছে পরোক্ষ অর্থনৈতিক ভূমিকা, কারণ, তা ভোগ্যপণ্যের বাজারকে বিস্তৃত করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব খাতে সৃষ্টি করে বাড়তি উৎপাদন প্রণোদনা, যদিও তা সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। তেমনি শিক্ষা খাতে ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।

এ রকম সমীক্ষা বিশ্বের অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশেও চালানো হয়েছে, যার ফলাফল প্রায় অভিন্ন। তবে এল সালভাদরে দেখা গেছে, প্রবাসী-আয় বৃদ্ধির ফলে সেখানে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমে গিয়ে শিক্ষা খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফিলিপাইনেও দেখা গেছে, প্রবাসী-আয়ের বড় অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয়ের প্রবণতা বেশি। আবার মেক্সিকোতে চালানো সমীক্ষায় দেখা গেছে, সেখানকার প্রবাসী-আয়ের বড় অংশ ব্যয় হয় তাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ এবং মূলধনি যন্ত্রপাতি আহরণে।

বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবাসী-আয় ব্যবহারের প্রবণতার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কারণ, মূলত যে শ্রেণির মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য দেশান্তরি হয়, তাদের পরিবারের প্রাথমিক প্রয়োজন থাকে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর, সে কারণেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা খাতে এই আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের কারণেই অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে দেখা দেয় কর্মচঞ্চলতা, যা তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো উপলব্ধি করা যায় না। আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে প্রবাসী-আয় সরাসরি উৎপাদনশীল কোনো খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ নেই, যা মেক্সিকোতে দেখা গেছে। তবে তাদের বিভিন্ন ধরনের ব্যয় অর্থনীতিতে সৃষ্টি করতে পারে কার্যকর চাহিদা, যার সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

আমাদের দেশের প্রবাসী-আয় বৃদ্ধি এবং তার কার্যকর বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। যেমন যেসব অদক্ষ শ্রমিক বৈধ-অবৈধ যেকোনো উপায়ে বিদেশে পাড়ি দিতে মরিয়া, তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধা দক্ষ করে দিতে পারলে বিদেশে তাদের উচ্চ মজুরি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, যা ভারত বা ফিলিপাইনের প্রবাসীরা ভোগ করে থাকেন। আবার প্রবাসীদের পোষ্য বা সন্তানদের যথাযথ শিক্ষার জন্য যদি জনশক্তি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে, তাহলে প্রবাসী-আয়ের অর্থ সরাসরি মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যয়িত হওয়া নিশ্চিত করা যায়। এজাতীয় আরও বহু উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণের অবকাশ রয়েছে এই খাতের উন্নয়নে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কে বা কারা নেবে এই দায়িত্ব আমলারা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নাকি কোনো চিন্তাশীল আলোকিত মানুষদের কেউ?

লেখক : ব্যাংকার

ডলারের দ্বিতীয় বড় উৎস হবে অফশোর ব্যাংকিংয়ের আমানত

মাসরুর আরেফিন

বেসরকারি খাতের প্রথম প্রজন্মের ব্যাংকগুলোর একটি সিটি ব্যাংক। ক্রেডিট কার্ড, ডিজিটাল সেবা, ভোক্তাঋণ, তাৎক্ষণিক ঋণসহ নানা সেবায় শীর্ষে ব্যাংকটি। ব্যাংক খাতের সমসাময়িক নানা বিষয়ে কথা বলেছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন

আপনারা বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (আরএফসিডি) ও অফশোর ব্যাংকিংয়ে বেশ মনোযোগ দিচ্ছেন। এর কারণ কী?

মাসরুর আরেফিন: এ দুই ব্যবস্থাই আমাদের ব্যাংক খাত ও অর্থনীতির জন্য যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের পাশাপাশি ডলারের জোগানে আরও নতুন দুটি খাত যুক্ত হয়েছে। একটি আরএফসিডি বা নগদ ডলারের সরবরাহ। অন্যটি অফশোর ব্যাংকিংয়ের স্থায়ী আমানত। দুটিই আমদানি ব্যয় মেটাতে কাজে লাগছে। আরএফসিডির ডলার নগদ ডলার হলেও আমরা নানা বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা দিয়েও আমদানি ব্যয় মেটাতে পারছি। আবার এই দুই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডলার আন্তব্যাংকে বিক্রি করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ডলার-টাকা 'সোয়াপ' বা বিনিময় করে আমরা টাকার সরবরাহও বাড়াতে পারছি। দেশের নগদ ডলারের স্থিতি সম্প্রতি ৮০ লাখ ডলারে নেমে এসেছিল। আমাদের আরএফসিডির কারণে কিছুদিন আগে তা ৫ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এই ৫ কোটি ডলারের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ ডলারই ছিল সিটি ব্যাংকের। বর্তমানে আমাদের ৫ হাজার ৫৮২টি আরএফসিডি হিসাবে ১ কোটি ৭০ লাখ ডলার জমা হয়েছে। এ ছাড়া অফশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় সাড়ে ৮ শতাংশে বিদেশি ঋণ নিয়ে আমদানি দায় শোধের চেয়ে দেশের মানুষকে সাড়ে ৭ শতাংশ সুদ দিয়ে স্থায়ী আমানত নেওয়াটা অনেক ভালো। বর্তমানে অফশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদি স্থায়ী আমানতের সুদহার ৬ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ। আর এই আয় সম্পূর্ণ করমুক্ত।

অফশোর ব্যাংকিংয়ের আমানতে কেমন সাড়া মিলছে। আপনাদের লক্ষ্য কী?

মাসরুর আরেফিন: অফশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় এখন আমাদের আমানতের স্থিতি ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। আরেকটি হিসাবে ৫০ লাখ ডলার আসছে। বাংলাদেশে বাস করছেন, এমন যে কেউ এখন আমাদের ১৭৫টি শাখা-উপশাখায় গিয়ে অফশোর আমানতের জন্য ডলারের চলতি হিসাব খুলতে পারছেন। তারপর বিদেশে তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বা ব্যবসায়িক অংশীদারকে বলছেন ওই হিসাবে ডলার পাঠাতে। আমরা এটাকে বলছি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক হিসাব। এটিও অফশোর আমানত হিসাব, কিন্তু দেশে থাকা মানুষদের জন্য। আমাদের এ ধরনের হিসাবে জমা হয়েছে ২৯ লাখ ডলার। মানুষ ভালোমতো জানলে আমাদের ব্যাংকগুলোর অফশোর আমানত হিসাবে ৫০ বিলিয়ন বা ৫ হাজার কোটি ডলার আসবে। ১৫ বিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ মরিশাসে যদি অফশোর আমানত ৮০০ বিলিয়ন ডলার থাকতে পারে, তাহলে ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির বাংলাদেশে কেন ৫০ বিলিয়ন ডলার অফশোর আমানত থাকবে না? অফশোর আমানত একদিন এ দেশে ডলার আনার দ্বিতীয় বড় খাত হবে।

টাকা ও ডলারের বিনিময় হার কিছুটা বাজারভিত্তিক হলো। এতে কি সংকট কাটবে? অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী হতে পারে?

মাসরুর আরেফিন: টাকা ও ডলারের বাজারভিত্তিক হার দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। তবে বলে রাখা ভালো, ডলারের দর এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের মধ্যবর্তী দর ঠিক করেছে ১১৭ টাকা। এই দরকে মধ্যবর্তী দর বললেও এর নিচে বা ওপরে কোনো সীমা এখনো ঠিক করা হয়নি। ডলারের দাম মোটামুটি বাজারভিত্তিক হওয়ার কারণে প্রবাসী আয় বাড়বে। রপ্তানিও অন্য দেশের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় থাকবে। বিদেশি বিনিয়োগ বেশি আসবে। সব মিলিয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়বে। আমাদের অর্থনীতি আমদানি ও রপ্তানিনির্ভর। তাই আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে টাকার অবমূল্যায়ন ব্যষ্টিক অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব আনলেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে কি?

মাসরুর আরেফিন: হ্যাঁ, মূল্যস্ফীতি কিছুটা বাড়তে পারে। কারণ, আমদানি এ দেশে একটা বড় বিষয়। কিন্তু সত্যি বলতে ব্যাংকগুলো ডলারপ্রতি ১১৬-১১৭ টাকাতেই আমদানি ব্যয় মেটাত, যদিও বলা ছিল দর ১১০ টাকা। তার মানে আমদানি ব্যয় বাস্তবে বাড়বে শুধু সরকারি আমদানিতে, যেগুলো ১১০ টাকা ডলার দরে হতো, যেমন জ্বালানি। আর মূল্যস্ফীতি আগে থেকেই বেশি ছিল। এখন দরকার অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়ানো, যাতে করে বেতন বা মজুরি বাড়ে। তাহলে মূল্যস্ফীতির আঁচ গায়ে লাগবে না। মূল্যস্ফীতির ভয়ে ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। অর্থনীতিতে প্রধান বিষয় হলো মানুষ তার আয় দিয়ে জীবনমান ধরে রাখতে পারছে কি না, সেটা দেখা। যদি সেটি পারে তাহলে দেখার বিষয়, কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে তা করতে পারছে। জাপানে এক কেজি আলুর দাম বাংলাদেশি টাকায় ৪৫০ টাকা। কিন্তু জাপানের জনগণের মাথাপিছু আয় ৩৪ হাজার ১৭ ডলার। আর বাংলাদেশে এক কেজি আলু মাত্র ৪০ টাকা, কিন্তু মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৮৮ ডলার। কে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে বাজার করতে পারছে? একজন জাপানি লোক আমার চেয়ে ১৩ গুণ বেশি আয় করে বলে, ওই আলুর দাম তার কাছে সহনীয়। কাজেই লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতি ঘটাতে হবে, যাতে করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে। দেশি অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ও বিদেশি বিনিয়োগ দুটিই বাড়াতে হবে। পাশাপাশি মানুষের আয় বাড়াতে হবে। তাহলে মূল্যস্ফীতি কোনো ব্যাপার হবে না।

মাসরুর আরেফিনের এ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় প্রথম আলোর প্র-বাণিজ্য পাতার ১২ মে ২০২৪ সংখ্যায়। গুরুত্ব বিবেচনায় সাক্ষাৎকারটি এ সংখ্যায় যুক্ত করা হলো।

উত্তরা ব্যাংক রেমিট্যান্স সেবাসমূহ

আপনার কষ্টের রেমিট্যান্স

আপনার স্বজনের কাছে পৌঁছে দেবো আমরা।

আপনার রেমিট্যান্স সেবার জন্য
আজই কল করুন

www.uttarabank-bd.com

16645

উত্তরা ব্যাংক পিএলসি.

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত

কর্মী দক্ষ করে না পাঠালে রেমিট্যান্স বাড়বে কীভাবে

ড. আলী আকবর মল্লিক

একটি ভবন নির্মাণে সুদক্ষ নকশাবিদ (আর্কিটেক্ট) যেমন দরকার, তেমনি সুদক্ষ স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার অপরিহার্য। নকশা ও ডিজাইন অনুসারে মাঠপর্যায়ে কাজটি সম্পন্ন করতে ভালো সাইট ইঞ্জিনিয়ারও থাকতে হবে। একটি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করতে রাজমিস্ত্রি, স্যানিটারি বা প্লাম্বারমিস্ত্রি, ইলেকট্রিকমিস্ত্রি, টাইলমিস্ত্রি, থাই গ্লাসমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি কারও অবদান বা দক্ষতাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। হোয়াইট কলার লেবার আর ব্লু কলার লেবার সবাই গুরুত্বের।

ভবন নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কর্মী দেশে বা বিদেশে যেখানেই কাজ করুন না কেন, দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা লোক হয় কম মূল্যায়িত হবে না হয় কাজ থেকে ছিটকে পড়বে। বিদেশের ক্ষেত্রে অন্য দেশ থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে হয়। শুধু টিকে থাকলেই চলে না, অবমূল্যায়ন যাতে না হয়, তার নিশ্চয়তা থাকতে হয়। কিন্তু সবকিছুর মূলে থাকে দক্ষতা। অদক্ষ লোক পদে পদে হেনস্তার শিকার হন। একই কাজে অন্য দেশের লোক যখন মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা পান, তখন অদক্ষ লোকটি কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হন।

ফিলিপাইন বা ভিয়েতনামি প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বিদেশের মাটিতে কাজ করার সময় তাঁদের দক্ষতার চেয়ে আমাদের কোথায় যেন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বেতন-ভাতার ব্যবধানও অনেক, যা চোখে পড়ার মতো। আমাদের চেয়ে কমসংখ্যক ফিলিপিনো প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বছরে রেমিট্যান্স আমাদের থেকে দেড় গুণেরও বেশি। কারণটা হলো তাঁরা স্কিলড্ লেবার হিসেবে পৃথিবীব্যাপী সুনাম কুড়িয়েছেন।

আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা ওকালতি যে পেশারই হোক না কেন, একটি পেশাদারি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে ওই পেশার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ করতে হবে। এবং সেই মতে লাইসেন্স পেতে হবে। এমন প্রথা জাপানসহ বেশির ভাগ দেশে চালু আছে। অদক্ষ ডাক্তারের হাতে যেমন একজন রোগীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তেমনি অদক্ষ প্রকৌশলীর হাতে একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মিত হয়ে কয়েক শ বা হাজার লোকের জীবন বিপন্ন হতে পারে। যার দুঃখজনক উদাহরণ ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রানা প্লাজা ধসে ১ হাজার ১৩৪টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়া। এ জন্যই স্টিয়ারিং ধরার আগে একজন গাড়িচালকের যেমন পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকা দরকার তেমনি

যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ডিজাইন করা ভবনে শত বা হাজার লোক থাকে তার উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে। দক্ষতা প্রমাণ করতে কঠিন পরীক্ষার বিকল্প নেই।

সর্বস্তরের পেশাজীবীর উপযুক্ত দক্ষতা থাকা দেশ ও বিদেশে কাজ করার জন্য অপরিহার্য। দক্ষ কর্মিবাহিনী তৈরি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্তমানের রেমিট্যান্সের পরিমাণ কম হলেও দ্বিগুণ করতে পারে। পেশাজীবীদের কাছ থেকেই ফি নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগের। একটা সিস্টেমে আসতে হবে। বর্তমানে যা আছে, তা কার্যকর নয়। এমনকি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে একটি এক্স-রে মেশিন যে চালাচ্ছেন, তাঁর গলায় আইডি কার্ড দেখা যায় না। কী তাঁর পরিচয়, তা জানার অধিকার রোগীর থাকলেও তিনি জানতে পারলেন না কে কী যোগ্যতার বলে তাঁর এক্স-রেটা করলেন।

ভবনের নকশা করা যেমন গুরুত্বের, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বের কাঠামোর ডিজাইন। একজন কাঠামো প্রকৌশলীকে পেশাজীবী হতে হলে একটি প্রফেশনাল পরীক্ষা পার হতে হবে। তার আগে নির্দিষ্ট বছরের ইন্টার্ন কোর্স শেষ করতে হবে ও নির্দিষ্ট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তারপর পেশাজীবী হওয়ার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। উত্তীর্ণ হলে নামের সঙ্গে নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য এসই (স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার) ব্যবহার করবেন।

পেশাদারি কোনো কাজে অংশগ্রহণ করলে একটা আইডি কার্ড গলায় ঝুলে থাকবে। এমনিভাবে ভবনের নকশায় পেশাদার স্থপতি নামের সামনে পিই (প্লানার আর্কিটেক্ট) বা এমন কিছু ব্যবহার করবে। এভাবে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারের নামের সামনে সিএসই লেখা থাকবে। মোটকথা কোনো বিষয়ের ওপর পেশাজীবী হতে হলে ওই বিষয়ে নির্ধারিত পরীক্ষায় পাস করে একটা আইডি কার্ড গলায় ঝোলাতে হবে। যিনি গলায় আইডি কার্ড ঝোলাতে পারবেন না, তাঁর পক্ষে কোনো পেশাজীবী কাজ করা চলবে না। ফিলিপিনোদের মতো দক্ষ জনবলের নাম কুড়াতে হলে আইডি কার্ড ঝোলানোর যোগ্যতা থাকতে হবে।

বর্তমানে দেশে রাজমিস্ত্রি, স্যানিটারি বা প্লাম্বারমিস্ত্রি, ইলেকট্রিকমিস্ত্রি, টাইলমিস্ত্রি, থাই গ্লাস মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি বা একজন গাড়ির ড্রাইভার 'ওস্তাদ'-এর কাছ থেকে কাজ করার মধ্য দিয়ে শেখেন। যার ফলে তাঁরা হচ্ছেন অদক্ষ, না হয় অর্ধদক্ষ কর্মী। এঁদের পক্ষে জাত মিস্ত্রি হওয়া কোনো দিনও সম্ভব হয় না। বিদেশে বসে কোনো তৃতীয় দেশের লোকজনদের কাছে টিকতে না পেরে এঁরা কম বেতনে চাকরি করেন। আমাদের দেশ রেমিট্যান্সে ভালো করতে পারছেন না এ জন্যই। তাই দেশের ৬৪টি জেলা শহরে একটা করে প্রশিক্ষণকেন্দ্র থাকবে যেখানে রাজমিস্ত্রি, স্যানিটারি বা প্লাম্বারমিস্ত্রি, ইলেকট্রিকমিস্ত্রি, টাইলমিস্ত্রি, থাই গ্লাস মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি যে যাঁর পেশা অনুসারে তিন বা ছয় মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করবেন।

পেশাদার নন এমন শ্রমিকদেরও কম হলেও এক মাস প্রশিক্ষণ দরকার। কোর্সের মধ্যে নিরাপত্তার বিষয়টি ভালোভাবে থাকতে হবে। কারণ, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় থাকে না বলে শ্রমিকদের দুর্ঘটনার হার বেড়ে গেছে। তারপর বসতে হবে একটি কঠিন পরীক্ষায়। পাস করলে গলায় ঝুলবে আইডি কার্ড। কার্ডে যে ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তার নাম ও ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ থাকবে। এমন দক্ষ কর্মীরা দেশ গড়ার কাজে ও বিদেশে উঁচু বেতনে কাজ করে রেমিট্যান্স প্রবাহে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারবেন।

যেসব প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বের পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকেন তাঁদের দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলতি নির্মাণ প্রজেক্টের ডিটেইল ডিজাইন (ডিডি) ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশনে (সিই) বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের খুব কম দেখা যায়। তবে খুব কমসংখ্যক হলেও তাঁরা দেশের রেমিট্যান্সে অবদান রাখছেন। কারণ, তাঁদের পরিবার দেশে রেখেই তাঁরা স্বল্পকালীন পরামর্শকের কাজে বিদেশ যান। তাঁদের মাসিক রেমিট্যান্স একজন শ্রমজীবীর চেয়ে কম হলেও ২০ গুণ। তাই এই পেশাজীবীর সংখ্যা বাড়ানোর দরকার। সে জন্য পেশাজীবী প্রকৌশলী তৈরি করার বিকল্প নেই। যাঁদের নামের সামনে থাকবে পিই বা এসই, গলায় থাকবে একটা অইডি কার্ড।

সর্বস্তরের পেশাজীবীর উপযুক্ত দক্ষতা থাকা দেশ ও বিদেশে কাজ করার জন্য অপরিহার্য। দক্ষ কর্মিবাহিনী তৈরি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্তমানের রেমিট্যান্সের পরিমাণ কম হলেও দ্বিগুণ করতে পারে। পেশাজীবীদের কাছ থেকেই ফি নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগের। একটা সিস্টেমে আসতে হবে। বর্তমানে যা আছে, তা কার্যকর নয়। এমনকি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে একটি এক্স-রে মেশিন যে চালাচ্ছেন, তাঁর গলায় আইডি কার্ড দেখা যায় না। কী তাঁর পরিচয়, তা জানার অধিকার রোগীর থাকলেও তিনি জানতে পারলেন না কে কী যোগ্যতার বলে তাঁর এক্স-রেটা করলেন।

লেখক: কাঠামো প্রকৌশলী ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ

টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রবাসী আয়ের গুরুত্ব

অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার, মোঃ হাসানুর রহমান (হাসান)

বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং নেক্সট ইলেভেন (ঘ-১১) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রোল মডেলের ভূমিকা পালন করে আসছে। একইসাথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলোতে প্রতিবেশী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সামনের সারিতে বাংলাদেশ। বর্তমান বিশ্বের অনেক স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আদর্শ হিসেবে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশের ওপরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যদিও করোনা মহামারির সময়ে এ ধারা কিছুটা কমে যায় এবং করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার তার পূর্বের ধারায় ফিরতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির আকার ও বিভিন্ন খাতে যেমন কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য যা কিনা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যে কয়েকটি নিয়ামক সব থেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক রেমিটেন্স। বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বৈদেশিক রেমিট্যান্স কাজ করছে এবং আয়ের বাহ্যিক উৎস হিসাবে বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স জিডিপি এবং অর্থপ্রদানের ভারসাম্যে যথেষ্ট অবদান রাখছে। বৈদেশিক মুদ্রার এই প্রবাহ শুধুমাত্র দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে স্থিতিশীল করে না বরং জ্বালানি খরচ এবং বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সাম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে রেমিটেন্স আহরণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, এশিয়া মহাদেশে রেমিটেন্স আহরণে প্রথমে আছে ভারত, এরপর পাকিস্তান, তৃতীয় বাংলাদেশ, চতুর্থ নেপাল এবং পঞ্চম অবস্থানে আছে শ্রীলঙ্কা।

বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক রেমিট্যান্স এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার একটি প্রাথমিক কারণ হল দারিদ্র্য বিমোচনে এর প্রভাব। এর জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্ন আয়ের কাজকর্মের উপর নির্ভর করে, বিশেষ করে কৃষি খাতে বা ডে-লেবার, রেমিট্যান্স অনেক পরিবারের জন্য একটি জীবনরেখা হিসাবে কাজ করে, তাদের দারিদ্র্য থেকে বের করে আনে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এই বৈদেশিক রেমিট্যান্স স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং আবাসনের মতো প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলির মেটাতে সহায়ক, যার ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান পূরণে বৈদেশিক রেমিট্যান্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে, যেখানে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার প্রায়ই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিল্প সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত, রেমিট্যান্স প্রবাহ বিনিয়োগের মূলধনের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস প্রদান করে। এর ফলে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সুবিধা হয়, উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিদেশি রেমিট্যান্স আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলের ব্যবহারকে প্রচার করে এবং রেমিট্যান্স প্রাপকদের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আচরণকে উত্সাহিত করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখে। এটি কেবল আর্থিক মধ্যস্থতার দক্ষতা বাড়ায় না বরং সামগ্রিক আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করে, যার ফলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, গত অক্টোবর-২০২৩ এর পর থেকে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ পরবর্তী মাসগুলোতে একটানা বেড়েছে। প্রবাসীরা গত অক্টোবর-২০২৩ প্রায় ২১৭ দশমিক ৮২ বিলিয়ন টাকা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে, যা গত মাসের থেকে ৭১ দশমিক ০৮ বিলিয়ন টাকা বেশি। এর পরবর্তী মাসে (নভেম্বর) রেমিট্যান্স প্রবাহ সামান্য কিছুটা কমে হয় ২১৪ বিলিয়ন টাকা এবং গত ডিসেম্বর মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াই ২১৯ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন টাকা। নতুন বছরে (২০২৪) প্রথম মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৩১ দশমিক ১০ বিলিয়ন টাকা যা গত ডিসেম্বর মাসের থেকে ১১ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন টাকা বেশি। বিশ্বব্যাংকের ব্যাংকের ২০২৩ এর রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্য বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সবার উপরে রয়েছে ভারত। ২০২২ সালে ভারতের প্রবাসী আয় ১১১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। যা বিশ্বের মোট রেমিট্যান্সের ১৩ দশমিক ২৪ শতাংশ। দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। ভারতের জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৬ নম্বরে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয়ে পাকিস্তানের জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এদিকে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ যা জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৪ নম্বরে। এদিক থেকে জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ভারতের থেকে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেশি যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে ইঙ্গিত করছে এবং সামনের দিনগুলোতে রেমিট্যান্সের প্রবাহকে বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রেখে, সঞ্চয়-বিনিয়োগের ব্যবধান পূরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে সরকারের নানামুখি পদক্ষেপ রেমিট্যান্স যোদ্ধাদেরকে আরও বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করছে। কার্যকরভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

লেখকদ্বয়: *অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি, জামালপুর সদর।*

বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াব কীভাবে

মামুন রশীদ

২০০৪-২০০৫ সালের কথা। বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটে (বিইআই) বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রবাসী আয়ের আকার বা পরিমাণের ওপর এক আলোচনায় অংশ নিয়ে জানতে পারলাম, ওই সময়েই এটি ছিল ২০ বিলিয়ন ডলারের মতো আর তার মধ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে তৎকালে আসছিল ১১-১২ বিলিয়ন ডলারের মতো।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল কিছুদিন আগে এক আলোচনায় বলেছিলেন, 'আমাদের সম্ভাব্য বা প্রাক্কলিত প্রবাসী আয়ের মাত্র ৫১ শতাংশ আসে বৈধ পথে আর বাকিটা হুন্ডি হয়ে। এটি বিবেচনায় নিলে আমাদের প্রাক্কলিত প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের পরিমাণ বর্তমানে প্রাপ্ত ২২-২৩ বিলিয়ন ডলার বিবেচনায় নিয়ে ৪০-৪২ বিলিয়ন ডলার।'

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে জানতে পেরেছি, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে সচেতনতা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে আমাদের প্রবাসীকল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বিদেশ থেকে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণের সুপারিশও করেছে কমিটি।

কমিটির বৈঠকে বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ১০টি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়। কারণগুলো হলো বৈধ পথের তুলনায় অবৈধ পথে রেমিট্যান্সে বিনিময় হারের বেশ ফারাক, প্রবাসী কর্মীর বৈধ কাগজপত্র না থাকা, প্রবাসে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা না থাকা বা পর্যাপ্ত শাখার অভাব।

এ ছাড়া বাংলাদেশি মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান না থাকা বা পর্যাপ্ত মানি এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট না থাকা, রেমিট্যান্স প্রেরণে উচ্চ ফি বা সার্ভিস চার্জ এবং নির্ধারিত সীমা (সিলিং), হুন্ডি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, অনেক ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বা প্রবাসীদের নিকটাত্মীয়দের দেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না, আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রতিবন্ধকতা, অননুমোদিত ব্যবসা বা কাজের আয় বৈধ পথে প্রেরণের সুযোগ না থাকা, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে সচেতনতা ও উৎসাহের অভাব।

এতে বলা হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা জেলা থেকে সর্বোচ্চ ৮০ হাজার ৫৭২ জন বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ৪৯ হাজার ৩৯১, চট্টগ্রাম থেকে ৪৩ হাজার ৮, টাঙ্গাইল থেকে ৩৮ হাজার ৭১২, চাঁদপুর থেকে ৩৪ হাজার ৯৫৬, কিশোরগঞ্জ থেকে ৩২ হাজার ৯০৭, নোয়াখালী থেকে ৩০ হাজার ৮৪১, ময়মনসিংহ থেকে ৩০ হাজার ৮০, নরসিংদী থেকে ৩০ হাজার ২৯ এবং ঢাকা থেকে ২৬ হাজার ৮৮৩ জন বিদেশে কর্মসংস্থান পেয়েছেন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়নে উন্নয়ন সহযোগীরা ইতোমধ্যে স্থানীয় রাজস্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাপক আয় বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে। ভারত, ফিলিপাইন, মেক্সিকো এমনকি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায়ও প্রবাসী আয় বাজার অর্থনীতি বা বিশ্বায়নের এই যুগে বিদেশি মুদ্রায় বর্ধিষ্ণু দায় নিষ্পন্নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। আমাদেরও সেই পথ ধরে, এমনকি সংসদীয় কমিটির সুপারিশ আমলে নিয়ে বৈধ পথে প্রবাসী আয় আনায় উঠেপড়ে লাগতে হবে।

একই বৈঠকে বিদেশগামী জনবলকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং বিদেশে শ্রমিক মৃত্যুজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়। সেই সঙ্গে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণে নতুন নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণ ও অভিবাসনসংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বের সব শ্রম চাহিদার দেশে যুক্তিসংগত বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে জনশক্তি পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণেরও অনুরোধ করা হয়।

আমাদের প্রাক্কলিত বা সম্ভাব্য প্রবাসী আয়ের একটি বিরাট অংশ বিদেশি মুদ্রায় দেশে না এলেও তার সমপরিমাণ এমনকি ৫ থেকে ১০ শতাংশ বেশি স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকা কিন্তু চলে আসে। এমনকি প্রবাসীদের স্থানীয় আত্মীয়স্বজনের আগাম ঋণও দেওয়া হয়। শুধু সৌদি রিয়াল, ইউএই দিরহাম বা অন্যান্য বিদেশি মুদ্রা চলে যায় অন্য কোনো দেশে আন্ডার-ইনভয়েসিং বা আমদানির বিপরীতে কর ফাঁকির কাজে বা বিদেশে সম্পদ পাচারে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়নে উন্নয়ন সহযোগীরা ইতোমধ্যে স্থানীয় রাজস্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাপক আয় বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে। ভারত, ফিলিপাইন, মেক্সিকো এমনকি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায়ও প্রবাসী আয় বাজার অর্থনীতি বা বিশ্বায়নের এই যুগে বিদেশি মুদ্রায় বর্ধিষ্ণু দায় নিষ্পন্নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

আমাদেরও সেই পথ ধরে, এমনকি সংসদীয় কমিটির সুপারিশ আমলে নিয়ে বৈধ পথে প্রবাসী আয় আনায় উঠেপড়ে লাগতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোকে আরও তৎপরতা দেখাতে হবে। এ কাজে অন্য কিছু দেশের মতো বিশ্বব্যাংকেরও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। হুন্ডিকে চতুরভাবে উৎসাহিত করার কাজে যুক্ত কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক বা তাদের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। রপ্তানি আয় দ্রুত প্রত্যাবাসনসহ বাজারে সব উপায়ে ডলারের জোগান বাড়াতে হবে আর বিনিময় হারেও আনতে হবে স্থিতিশীলতা।

লেখক: ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

বি এ এক্সপ্রেস ইউএসএ ইন্‌ক

Licensed as a Money Transmitter by New York State Department of Financial Services

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠাতে বিএ এক্সপ্রেস আপনার পাশেই আছে-
সঠিক রেট এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে নিরাপদে টাকা পাঠান, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনিও হউন গর্বিত অংশীদার।

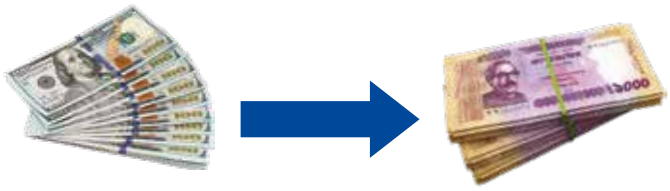

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

Corporate Office

37-17 74th Street, Suite# 1F, Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) -880-1188

Brooklyn Branch

484 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218

Tel: (347) 627-2857

Ozone Park Branch

76-01 101st Ave,
Ozone Park, NY 11416

Tel: 718-480-6075

Jamaica Branch

87-58 168th Street, (Hillside Ave)
Jamaica, NY 11432

Tel (718) 880-1034

Email : cs@baexpressusa.com

শুধু প্রবাসী আয় বাড়ানো নয়, আরও যা যা করতে হবে

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার ও কে এম নূর-ই-জান্নাত

দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স কী শক্তিশালী অবদান রাখছে, তা করেও অজানা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়ভাবে প্রবাসীদের এই অবদানের সেই অর্থে স্বীকৃতি নেই, থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকা, প্রবাসী আয় বাড়ানো, প্রবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধি, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংস্কার এসব বিষয় নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার ও কে এম নূর-ই-জান্নাত

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের যে ব্যাপক ভূমিকা ছিল, তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবাসীদের বারবার অনুরোধ করা হয় রেমিট্যান্সকে হাতিয়ার হিসেবে নিতে, তখন থেকেই প্রবাসীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে কয়েক দিনের ব্যবধানে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ জুন মাসের তুলনায় ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ কম। এতে বাংলাদেশের জুলাই মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগের মাসের থেকে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার কমে যায় (ডেইলি স্টার)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রবাসীরা একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত নড়িয়ে দিতে সক্ষম। এ ঘটনা জাতীয় আয়ে প্রবাসীদের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। প্রবাসীরা সব সময় নিজেদের অবাঞ্ছিত ভাবলেও এ আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণে যে ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি রয়েছে, তা প্রকাশিত হয়েছে।

এ শক্তি সম্পর্কে প্রবাসীরা আগে কখনো বুঝে উঠতে বা উপলব্ধি করতে না পারলেও এ গণ-আন্দোলন তাঁদের এই শক্তি সম্পর্কে শিখিয়ে দিয়েছিল। তাই যখন দেশ ব্যাকআউটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসীরা রাস্তায় আন্দোলনের সমর্থনে নেমে পড়েছিলেন।

এই প্রবাসীদের মধ্যে যাঁরা আবার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত, তাঁরা আগে থেকেই জানতেন, এ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পরিণতি কী হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী জেল ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা শুধু নিজেদের মাতৃভূমির টানে এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

কাজেই প্রবাসীদের এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের মানসিকভাবে সাহস জুগিয়েছিল, শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেড় কোটি বাংলাদেশিও যে তাঁদের সঙ্গে আছেন, তা আন্দোলনকারীদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। এখন বৈধ পথে

প্রবাসী আয় বাড়ানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রবাসীদের বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ বাড়াতে আমরা যদি বেশি মনোনিবেশ করি, তাহলে আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাব। আবার পুরোনো চক্রেই আটকে যাব। তাই সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে আমাদের পুরো অভিবাসনপ্রক্রিয়ার সংস্কার করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং নোবেল বিজয়ী বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে নিম্নোক্ত অনুরোধ জানাচ্ছি।

অভিবাসীদের গণ-আন্দোলনের স্বীকৃতি

প্রথমত, আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করব টেলিভিশনে প্রবাসীদের উদ্দেশে একটি বক্তব্য প্রদানের জন্য, যেখানে তিনি এই আন্দোলনে প্রবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেবেন। তাঁদের দেশপ্রেম এবং এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি প্রবাসীদের মানসিক শক্তির সঞ্চার করবে।

একইভাবে এ বক্তব্যের মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রবাসীদের দেশে বৈধভাবে অর্থ পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করবে। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আমাদের এ অনুরোধও থাকবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি জেল-জরিমানার শিকার হয়েছেন, তাঁদের ওই সব দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যেন দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁদের চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

এসব প্রবাসী যদি কোনো কারণে চাকরি পেতে ব্যর্থ হন বা চাকরি হারান, সে ক্ষেত্রে দেশে ফেরার পর তাঁরা যেন সহজেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। এ ছাড়া অভিবাসন খাতে যেসব দুর্নীতির প্রচলন আছে, তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নতুন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে।

উচ্চ অভিবাসন খরচ, রিক্রুটিং এজেন্ট ও দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো

দ্বিতীয়ত, দেশে প্রবাসী আয় পাঠানো যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। বাংলাদেশের অভিবাসন খাত সংস্কার করতে হলে এই খরচের পরিমাণ অবশ্যই কমাতে হবে। বিভিন্ন সময়ে এ উচ্চ ব্যয় কমানোর আওয়াজ উঠলেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এ কারণে বাংলাদেশ থেকে যেসব অভিবাসী নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে বিদেশে যান, তাঁরা তাঁদের উপার্জিত আয়ের সিংহভাগ দিয়ে এই উচ্চ অভিবাসন খরচ মেটাতে বাধ্য হন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভিনদেশে প্রতিকূল পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমের পরেও প্রবাসীদের নিজেদের জন্য কোনো অর্থই আর থাকে না। এই উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে দুর্নীতিবাজ দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্টদের দৌরাত্ম্য। প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, বিগত সরকারের চার সংসদ সদস্য মালয়েশিয়ায় অভিবাসনের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। সিন্ডিকেটটি দেড় বছরে ২৪ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্য করেছে। তাঁদের এই দৌরাত্ম্যের কারণে সে সময় যাঁরা অভিবাসন নিয়ে কাজ করতেন, তাঁরা সবাই এই প্রভাবশালীদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। যদিও তাঁদের অনেকেরই রিক্রুটিং এজেন্ট ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তাঁরা দাবি করতেন, দালালদের কারণে এ অভিবাসন খরচ বাড়ছে।

তবে সত্যিকার অর্থে কিছু দুর্নীতিবাজ রিক্রুটিং এজেন্ট এবং বিভিন্ন নেতা-কর্মী, বিশেষ করে ওই পাঁচ প্রভাবশালী ব্যক্তির কারণে দেশে অভিবাসন খরচ বেড়ে চলছিল। এ পরিস্থিতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, খুব শিগগির যেন রিক্রুটিং এজেন্সির সংস্থা বায়রাকে (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ) সংস্কারের আওতায় আনা হয়।

এ ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয় মডেলের অনুসরণ করতে পারি। দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রকম র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে, রিক্রুটিং এজেন্টদের জন্যও একটি র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। র‍্যাংকিং পয়েন্ট অনুসারে এজেন্টদের সেবার মান, গ্রহণযোগ্যতা সব কিছু অভিবাসন নিয়ে কাজ করা ওয়েবসাইটগুলোয় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এসব রিক্রুটিং এজেন্টের প্রোফাইল ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্টের মধ্যে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি তাঁর ছেলেমেয়ে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দিয়ে একাধিক লাইসেন্স নিয়ে থাকেন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো কারণে তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করা হলে তাঁরা যেন অন্য লাইসেন্স দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ এই লাইসেন্সের ডুপ্লিকেশন হচ্ছে। দেখা গেছে, দেশে দুই হাজারের মতো লাইসেন্সধারী রিক্রুটিং এজেন্ট আছেন। অথচ বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার এ লাইসেন্সের সংখ্যার তুলনায় বিস্তৃত নয়। তাই শ্রমবাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে এ লাইসেন্সের সঠিক সংখ্যা নিরূপণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

তৃতীয়ত, অনেক সময় এই রিক্রুটিং এজেন্টদের সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তারাও জড়িত থাকেন। এসব কর্মকর্তার অনেকেরই আবার এসব এজেন্সিতে শেয়ার থাকে। দেশের অভিবাসন প্রক্রিয়া সংস্কারের লক্ষ্যে দ্রুত এসব কর্মকর্তাকে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তা ছাড়া রিক্রুটিং এজেন্টদের প্রতিনিধি নির্বাচনে যেন সঠিক ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হন, এ জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

চতুর্থত, বাংলাদেশের স্থানীয় সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যস্বত্বভোগী (দালাল) সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ। তাই

16434
aibl.com.bd

মুদারাবা
ডাবল বেনিফিট
ডিপোজিট স্কিম

জমা রাখুন আস্থার সাথে
দ্বিগুণ হবে
৫ বছর ৬ মাসে

- কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা জমা রাখতে হবে
- জমাকৃত অর্থ ৫ বছর ৬ মাসে প্রায় দ্বিগুণ
- ১৩.৭৮% (প্রাক্কলিত) মুনাফা
- এই স্কিমে যে কেউ হিসাব খুলতে পারবেন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

aib
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
Al-Arafah Islami Bank PLC.
সর্বদাই শরীয়াহ্

অভিবাসনপ্রক্রিয়া থেকে তাদের পুরোপুরি নির্মূল না করে আইনের কাঠামোয় এনে তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ফি প্রদানের ব্যবস্থা করে তাদের এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে; প্রয়োজনে তাদের জন্য এলাকাভিত্তিক অফিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ

সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়োগপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মী নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়া অভিবাসীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে জব পোর্টাল তৈরি করতে হবে। এ পোর্টালে অভিবাসীদের বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি তাঁরা কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ট্রেনিং পেয়েছেন কি না, এ তথ্য সিভি আকারে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে সহজেই পোর্টাল থেকে দক্ষ কর্মী খুঁজে নিতে পারবে।

সপ্তমত, আমাদের প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হবে। দুঃখের বিষয়, অভিবাসী কর্মীরা বাংলাদেশের সমাজে প্রতিনিয়ত অবহেলার শিকার হচ্ছেন। এসব অভিবাসী যখন দেশে ফেরত আসেন, তখন তাঁদের দেশের সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণের কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। কাজেই এসব অভিবাসী কর্মীকে কীভাবে বাংলাদেশের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

প্রয়োজনে জেলাভিত্তিক জব ফেয়ারের মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশ থেকে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন, তা যেন এ দেশে কাজে লাগানো যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অভিবাসী কর্মীরা যদি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চান, সে ক্ষেত্রে স্বল্পসুদে (সর্বোচ্চ ২ শতাংশ হারে) তাঁদের ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

অষ্টমত, আমাদের অনুরোধ থাকবে, প্রধান উপদেষ্টা যেন তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বহির্বিশ্বে কারিগরি শিক্ষাকে যে সম্মানের সঙ্গে দেখা হয় এবং এখান থেকে শিক্ষার্থীদের যে উচ্চ বেতনের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা যেন তিনি তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। দেশের অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সন্তানদের টেকনিক্যাল সেন্টারে পাঠাতে তিনি উৎসাহ দিতে পারেন। এতে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা পরিবর্তন আসতে পারে।

আমাদের অনুরোধ থাকবে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকীকরণে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে যেন যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনে এ খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছেন। তাঁদের অনেকেই ওই সব দেশে অবৈধভাবে প্রবেশের কারণে জেল খাটছেন, শাস্তি পাচ্ছেন। তাঁদের দ্রুত দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেশে তাঁদের প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশের অর্থনীতিতে এই প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশে আসার পর তাঁরা কোনো ধরনের সামাজিক মর্যাদা পান না। বিভিন্ন দূতাবাস থেকে শুরু করে বিমানবন্দরগুলোয় লাগেজ হারিয়ে যাওয়া, ট্রলি খুঁজে না পাওয়ার পাশাপাশি আলাদা কোনো লাইন না থাকায় তাঁরা নানা বিড়ম্বনা ও হয়রানির শিকার হন। অথচ প্রবাসীদের অংশগ্রহণ এ গণ-আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে দ্রুত এই গণ-আন্দোলনে অভিবাসীদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের অভিবাদনের ব্যবস্থা করা। আমরা আশা করছি, চলমান পরিস্থিতি উন্নয়নেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

লেখক:

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার

শিক্ষক ও সদস্য, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

কে এম নূর-ই-জান্নাত

গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

যে উপায়ে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভিআইপি মর্যাদা দেয়া যায়

মাসুদ খান

দুই বছর ধরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার দুটি প্রধান উৎস হলো রপ্তানি ও রেমিট্যান্স।

যদিও আমরা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সব সময়ই মনোযোগী ছিলাম, কিন্তু আমরা রেমিট্যান্স বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে অনেকাংশে উপেক্ষা করেছি।

গত অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো। যদি আমরা প্রায় ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজন বিবেচনা করি, নিট বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রায় ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে চলমান প্রেক্ষাপট বিচার করলে এ বছর রেমিট্যান্স ২৭ থেকে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে হতে পারে।

যদিও আমরা 'ক্যারট অ্যান্ড স্টিক' ম্যানেজমেন্ট থিওরি অনুযায়ী যে বিষয়টাতে অধিক মনোনিবেশ করা দরকার, সেটা করি না। যখন রেমিট্যান্স আসে, আমাদের ফোকাস মুখ্য জায়গাটা থেকে সরে গিয়ে গৌণ দিকে বেশি থাকে। আমরা হুন্ডির মতো অনানুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স চ্যানেলগুলোকে ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরেছি, যখন অফিশিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সে শুধু ৬ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করছি, যা কাম্য নয়।

আনুষ্ঠানিক উপায়ে রেমিট্যান্স পাঠাতে প্রবাসীদের ব্যাংক এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত রেমিট্যান্স হাউসের দ্বারস্থ হতে হয়। একজন অদক্ষ শ্রমিকের কথা চিন্তা করুন, যিনি দুবাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ক্লান্ত মানুষটি বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে এক্সচেঞ্জ হাউসের জটিল ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় না গিয়ে একটি হুন্ডি অপারেটরকে শুধু একটি ফোন কল করে বিনিময় হারে সম্মত হন এবং দেশে পরিবার-পরিজনের কাছে টাকা পাঠান। তিনি এটি করেন আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বাইপাস করে।

মাসলোর চাহিদা তত্ত্ব অনুযায়ী, শারীরিক ও নিরাপত্তা চাহিদার পর মানুষ সামাজিক, আত্মমর্যাদা ও পরিপূর্ণতার চাহিদার দিকে ধাবিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা প্রবাসীদের জন্য এই উচ্চতর চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ করার মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে

পারিনি। এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রায়শই খারাপ আচরণ করা হয়। বিমানবন্দর কিংবা বিদেশি দূতাবাস, কোথাও তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা একপ্রকার উপেক্ষিত।

সম্প্রতি আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বিষয়টিকে সময়োপযোগীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভিআইপি হিসেবে গণ্য করা উচিত। এ ক্ষেত্রে আমি একটি দ্বৈত কৌশল প্রস্তাব করতে চাই, যা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে তাঁদের আত্মমর্যাদা, সম্মান এবং একাত্মতার অনুভূতিকে সমুন্নত রাখতে পারে।

স্বল্প মেয়াদি সমাধান

১. একটি 'ওয়েজ ওনার্স এলিট ক্লাব' প্রবর্তন করা

স্বল্প মেয়াদে সরকারের উচিত একটি 'ওয়েজ ওনার্স এলিট ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রবাসীদের বিগত বছরে পাঠানো রেমিট্যান্সের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত করা হবে। সদস্যপদটির স্তরগুলো হবে প্যাটিনাম, গোল্ড, সিলভার ও ব্রোঞ্জ। প্রতিটি স্তরের আলাদা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।

২. ভিআইপি বিমানবন্দর পরিষেবা

এলিট ক্লাবের সদস্যদের জন্য আলাদা ইমিগ্রেশন এবং চেক-ইন কাউন্টার স্থাপন করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের সময় কার্ডধারীদের সরকারি খরচে বিমানবন্দরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। যাঁর যাঁর ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেবা দেওয়া হবে, যেমন প্রাইভেট কার কিংবা বাস দিয়ে এয়ারপোর্ট পিকআপ, ড্রপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. এক্সক্লুসিভ লাউঞ্জ

দেশে আসা-যাওয়ার সময় প্লাটিনাম, গোল্ড ও সিলভার কার্ডহোল্ডারদের ডেডিকেটেড এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে অ্যাকসেস থাকবে। অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ লাউঞ্জগুলোতে তাঁরা সার্ভিস পাবেন।

৪. স্বীকৃতি ও পুরস্কার

কার্ডধারীদের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হবে এবং তাঁদের অবদানের জন্য ক্রেস্ট প্রদান করা হবে। পাটিনাম ও গোল্ড কার্ডধারীরা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে গণ্য করা হবেন, বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাঁদের পরিশ্রম ও অবদান সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হবে।

৫. বিনা মূল্যে ভ্রমণসুবিধা

প্লাটিনাম ও গোল্ড কার্ডধারীরা তাঁদের রেমিট্যান্সের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে বিনা মূল্যে রাউন্ড-ট্রিপ টিকিট পাবেন। এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ ক্যাটাগরি অনুযায়ী টিকিটের ধরন বিজনেস ক্লাস কিংবা ইকোনমি ক্লাস হতে পারে।

৬. প্রবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স অ্যাপ তৈরি করা যায়। অ্যাপটির লক্ষ্য হবে রেমিট্যান্স প্রক্রিয়াকে সহজতর করা, যাতে তাঁরা নিজ দেশে নিরাপদ, দ্রুত এবং সহজে টাকা পাঠাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

• পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন: অ্যাপটিকে অবশ্যই দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন ব্যাংক ও রেমিট্যান্স হাউসগুলোর সঙ্গে লিংকড থাকতে হবে, যাতে প্রবাসীরা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ওয়ালেট বা রেমিট্যান্স হাউসগুলোর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন।

• মুদ্রার বিনিময় হার (এক্সচেঞ্জ রেট) এবং ট্রান্সফার ফির স্বচ্ছতা: প্রবাসীদের জন্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে লেনদেনের আগে রিয়েল-টাইম কারেন্সি কনভারশন রেট এবং যেকোনো প্রযোজ্য ফি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

• লেনদেনের নিরাপত্তা বিধান: বায়োমেট্রিক লগইন, ডাবল-ফ্যাক্টর সিকিউরিটি (২এফএ), অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) প্রবিধানগুলোর মতো লেনদেনে শক্তিশালী আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করতে হবে।

• ট্রানজেকশন ট্র্যাকিং: পুশ নোটিফিকেশন, এসএমএস এবং ই-মেইলের মাধ্যমে আপডেটসহ রিয়েল-টাইম লেনদেন ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে প্রবাসীরা লেনদেনে নিরাপত্তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবেন।

• ভাষাগত সুবিধা: প্রবাসীদের সুবিধার্থে একাধিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ থাকলে অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

• গ্রাহক সহায়তা: ২৪/৭ লাইভ চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং দ্রুততার সঙ্গে গ্রাহক সমস্যার সমাধান করা গেলে অ্যাপ ব্যবহারকারীদের আস্থা বাড়বে।

কেমন হবে এই রেমিট্যান্স মডেল

এই রেমিট্যান্স মডেলের মূল চাবিকাঠি হবে যোগাযোগ সক্ষমতা। এর বাস্তবায়নে একটি সুচিন্তিত প্রচারণাকৌশল অনুসরণ করা উচিত:

• বিভিন্ন দূতাবাসের সহযোগিতায় রোডশো: দূতাবাসগুলোকে প্রবাসীদের মধ্যে এই অ্যাপের সুফল প্রচারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। অ্যাপের সুবিধা এবং কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য রোডশো এবং সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে।

• মিডিয়া প্রচারাভিযান: একাধিক প্ল্যাটফর্মজুড়ে একটি ব্যাপক মিডিয়া প্রচারাভিযান চালাতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রিন্ট মিডিয়া: প্রবাসীদের অবগতির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে পূর্ণপৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন প্রচার।

WE ARE DELIGHTED TO BE PART OF THE BANGLADESH REMITTANCE FAIR 2024 IN NEW YORK, USA

Coming Soon
from New York
USA

THE 100
International Business Magazine

Chief Editor: Nurul Baten

NB MEDIA HOUSE
NB PUBLISHING HOUSE
NB REAL ESTATE
NB MANAGEMENT CONSULTANCY

NB FOUNDATION
NB ACADEMY
NB GROUP
NB Export Import
NB IT Consultancy

Nurul Baten
Founder, NB Group
Director, BUCCI
Coordinator, New York International Trade Fair and Chamber Expo 2024 &
Bangladesh Remittance Fair 2024
Chief Editor, BanglaNoboborsho 1430 Magazine

Contact Email
nbfoundation2021 @gmail.com

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া: টিভি ও রেডিওর মতো বহুল দর্শকসমৃদ্ধ গণমাধ্যমে প্রচার।

সোশ্যাল মিডিয়া: প্রবাসীদের ওপর ফোকাস করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, লিংকডইনের মতো প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার।

• প্রভাবশালী এবং প্রশংসাপত্র: দেশের বিশিষ্টজন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য প্রবাসীদের দিয়ে অ্যাপের ব্যাপারে তাঁদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা শেয়ার।

• ই-মেইল প্রচারাভিযান: নিয়োগকর্তা ও দূতাবাসের সহযোগিতায় প্রবাসীদের ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিতকরণ।

গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া

ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিত করতে এবং প্রদত্ত পরিষেবাগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করতে একটি গ্রাহক মতামত এবং মূল্যায়নব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

• নেট প্রমোটার স্কোর (এনপিএস) বাস্তবায়ন:

অভিবাসন পরিষেবা: অ্যাপের মাধ্যমে প্রদত্ত অভিবাসন-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলোর সঙ্গে ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপ করুন (যেমন ভিসা ট্র্যাকিং, রেসিডেন্সি পারমিট নবায়ন)।

মিট অ্যান্ড গ্রিট পরিষেবা: রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করুন, যাঁরা বিমানবন্দর বা অন্যান্য অফিশিয়াল ভেন্যুতে মিট অ্যান্ড গ্রিট পরিষেবা ব্যবহার করেন, যা অ্যাপে একত্র করা যেতে পারে।

দূতাবাসগুলোর কার্যকারিতা: প্রবাসীদের সঙ্গে দূতাবাসের কর্মীদের আচরণ এবং পরিষেবাগুলোর কার্যকারিতা যাচাইকল্পে এই অ্যাপ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি দূতাবাসগুলোর সেবার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

• ইন-অ্যাপ সার্ভে ইন্টিগ্রেশন: সংক্ষিপ্ত ও সহজ কিছু সার্ভের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যার মাধ্যমে প্রবাসীরা সেবার মান নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন।

• কন্টিনিউয়াস মনিটরিং: অ্যাপ এবং এর পরিষেবাগুলোর মানোন্নয়ন ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিতভাবে এনপিএস স্কোর এবং গ্রাহক প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করুন।

এই উন্নতিগুলো প্রবাসীদের সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতাকে সুখকর করবে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়াবে।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধান

প্রবাসীদের আত্মসম্মান সমুন্নত রেখে রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত করাড়

দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে রেমিট্যান্স উপার্জনকারীদের আর্থিকভাবে প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ।

১. বার্ষিক কার্ড নবায়ন এবং আপগ্রেড:

এলিট ক্লাব কার্ডগুলো বার্ষিক নবায়ন, সদস্যপদ হালনাগাদ, পূর্ববর্তী বছরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ এবং ধারাবাহিকতার ওপর ভিত্তি করে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি বিভাগে সেরা পারফরমারদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, যেমন ফ্রি রিটার্ন টিকিট বা উচ্চ স্তরের ভ্রমণ বিকল্প।

২. স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষাগত সুবিধা:

ভ্রমণসুবিধা ছাড়াও কার্ডধারীরা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাঁদের পরিবারের জন্য জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। তাঁদের সন্তানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং স্কুলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. মর্যাদা ও সম্মান:

দূতাবাস ও বিমানবন্দরগুলোকে মজুরি উপার্জনকারীদের সঙ্গে ডিল করার জন্য একটি গ্রাহকসেবা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দূতাবাসের কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যাতে প্রবাসীদের সঙ্গে সম্মান ও পেশাদারির সঙ্গে আচরণ করা হয়।

৪. একটি ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী:

মজুরি উপার্জনকারীরা, বিশেষ করে যাঁরা উচ্চ স্তরে রয়েছেন, তাঁরা পেনশন স্কিম, তাঁদের সন্তানদের জন্য শিক্ষামূলক বৃত্তি এবং সরকারের পক্ষ থেকে আবাসন ঋণসহ একটি সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে তাঁরা অ্যাকসেস পাবেন। এটি নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করবে, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে তাঁদের উৎসাহিত করবে এবং জাতির প্রতি আনুগত্য তৈরি করবে।

প্রবাসীদের নিজ নিজ পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ, স্বীয় আত্মসম্মান এবং দেশমাতৃকার জন্য তাঁদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এখন সময়ের দাবি। রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন, তাঁরা দেশের ওপর সন্তুষ্ট আছেন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদ বোধ করছেন। এটি নিশ্চিত করা গেলে আনুষ্ঠানিক পথে রেমিট্যান্স প্রবাহে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি আসবে এবং দেশপ্রেমিক রেমিট্যান্স যোদ্ধারা আরও আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হবেন।

***লেখক:** ইউনিলিভার কনজ্যুমার কেয়ার*

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: রেমিট্যান্স প্রবাহের শীর্ষে আরব আমিরাত; পিছিয়ে সৌদি আরব

এম মনিরুল আলম

বৈধ পথে বাংলাদেশের প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষস্থানে থাকা সৌদি আরব (কেএসএ) থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহে ধস নেমেছে। সৌদি আরবের স্থান এখন চতুর্থ। বরাবরের মতো সৌদি আরবে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক গেলেও রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমে আসার বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেলেও বরাবরের মতো দেশটি দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে। রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাজ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত রেমিট্যান্স সম্পর্কিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩০টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ইউএই থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৫৯ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার (৪ দশমিক ৫৯৯ বিলিয়ন)। আগের অর্থবছরে এসেছিল ৩০৩ কোটি ৩৯ লাখ ডলার (৩ দশমিক ৩৩৯ বিলিয়ন)। প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। এর মধ্যে ২০২৩ সালে ইউএইতে কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছেন ৯৮ হাজার ৪২২ জন। আর চলতি ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশটিতে নতুন শ্রমিক গেছেন ৩৩ হাজার ৪৬৫ জন।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকা সৌদি আরবের অবস্থান এখন চতুর্থ। মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ ধনী এ দেশটি থেকে সদ্যবিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে ধস নেমেছে। ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ২৭৪ কোটি ১৫ লাখ ডলার (২ দশমিক ৭৪১ বিলিয়ন)। আগের অর্থবছরে এসেছিল ৩৭৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলার (৩ দশমিক ৭৬৫ বিলিয়ন)। রেমিট্যান্স কমেছে ২৭ শতাংশ।

বিএমইটির তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থাৎ ৪ লাখ ৯৮ শ্রমিক কাজে গেছেন। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে গেছেন ২ লাখ ৫৪ হাজার জন।

সৌদি আরবে মোট বাংলাদেশি কর্মীর পরিমাণ বিশ্বের সব দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রায় ৩৯ লাখ। সৌদি আরবে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের এ পরিমাণ দেশটি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়া মোট শ্রমিকের ৩১ শতাংশ। অথচ এ দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাপক হারে কমে গেছে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান খবরের কাগজকে বলেন, এর কারণ হচ্ছে হুন্ডির দৌরাত্ম্য। ডলারের সংকট চলতে থাকায় হুন্ডি ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছিল। এদিকে, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, সৌদি আরব থেকে প্রবাসীরা ডলার নিয়ে আসে না, আনে স্বর্ণের বার। তাই বৈধ পথে প্রবাসী আয় যেমন কমছে তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত অর্থবছরে বিদেশ থেকে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের উৎস দেশ হিসেবে নতুন করে শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বারমুডা ও আফগানিস্তান। বারমুডা থেকে বিগত অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩ কোটি ৭৬ লাখ (১৩৭ দশমিক ৬০ মিলিয়ন) ডলার এবং আফগানিস্তান থেকে এসেছে ৩ কোটি ৭৫ লাখ (৩৭ দশমিক ৫০ মিলিয়ন) ডলার। শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে লেবানন ও আয়ারল্যান্ড।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, কাতার, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেছে। এর মধ্যে বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স কমেছে প্রায় ১৬ শতাংশ। গত অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ২৯৬ কোটি ১০ লাখ (২ দশমিক ৯৬১ বিলিয়ন) ডলার। আগের অর্থবছরে এসেছিল ৩৫২ কোটি ২০ লাখ (৩ দশমিক ৫২২ বিলিয়ন) ডলার। কমেছে ৫৬ কোটি ১০ লাখ (৫৬১ মিলিয়ন) ডলার। জাপান থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ৩২ শতাংশ। এ ছাড়া কাতার থেকে কমেছে ২১ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়া থেকে কমেছে ১১ শতাংশ এবং কুয়েত থেকে কমেছে প্রায় ৪ শতাংশ।

এদিকে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের জন্য তৃতীয় শীর্ষ উৎস দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। আগে যুক্তরাজ্যের স্থান ছিল চতুর্থ। দেশটি থেকে বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৭৯ কোটি ৩২ লাখ (২ দশমিক ৭৯৩ বিলিয়ন) ডলার। আগের অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স বেড়েছে ৭১ কোটি ২৮ লাখ (৭১২ মিলিয়ন) ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশ।

মালয়েশিয়া বাংলাদেশি প্রবাসী আয়ের পঞ্চম বৃহত্তর উৎস দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। দেশটি থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬০ কোটি ৭৭ লাখ (১ দশমিক ৬০৭ বিলিয়ন) ডলার। আগের অর্থবছরে এসেছিল ১১২ কোটি ৫৯ লাখ (১ দশমিক ১২৫ বিলিয়ন) ডলার। এক বছরের ব্যবধানে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪৮ কোটি ১৮ লাখ (১ দশমিক ৮০ মিলিয়ন)। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৩ শতাংশ।

বিএমইটি'র তথ্যানুযায়ী মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তর শ্রম বাজার। দেশটিতে মোট ১২ লাখের মতো বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ২০২৩ সালে গেছেন ৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন। ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে নতুন শ্রমিক গেছেন ৯২ হাজার ৬৮৫ জন।

ইউরোপের দেশ ইতালি থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ গত অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ শতাংশ। গত অর্থবছরে দেশটি থেকে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১৪৬ কোটি ১৬ লাখ (১ দশমিক ৪৬১ বিলিয়ন) ডলার। আগের অর্থবছরে এসেছিল ১১৮ কোটি ৫৯ লাখ (১ দশমিক ১৮৫ বিলিয়ন) ডলার। দেশটিতে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ৮০ হাজার ৫৯৯।

একই অর্থবছরে এশিয়ার অন্যতম ধনী রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। দেশটিতে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৮৯২ জন বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছে বলে বিএমইটির তথ্য রয়েছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স কখনোই ১ বিলিয়নের অঙ্কে পৌঁছায়নি। এ দেশ থেকে গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ৬৩ কোটি ২৩ লাখ (৬৩২ দশমিক ৩০ মিলিয়ন) ডলার। সমপরিমাণ বাংলাদেশি শ্রমিক রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে। কাতার থেকে ২১ শতাংশ রেমিট্যান্স কমলেও গত অর্থবছরে এসেছে ১১৫ কোটি (১ দশমিক ১৫০ বিলিয়ন) ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরও দুই দেশ ওমান ও বাহরাইন থেকে যথাক্রমে ৪২ শতাংশ ও ২১ শতাংশ। এ ছাড়া ফ্রান্স ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ সামান্য বেড়েছে।

লেখক: *জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, খবরের কাগজ*

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা অতি জরুরি

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

আমাদের সকলের জানা; আত্মকর্মসংস্থান, অধিক বেতন, উন্নত কর্মপরিবেশে জীবনযাপনের লক্ষ্যে দেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ বিদেশে পাড়ি জমান। তারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির ভীত মজবুতসহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করছেন। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারিকালে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রবাসী আয়ের ব্যাপক ভূমিকা কারো অজানা নয়। বিশ্বপরিমণ্ডলে অদম্য উন্নয়ন অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও এ অর্থ ব্যয় হয়। রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ দৈনন্দিন খাতে খরচ হওয়ায় পরিবারগুলোর দরিদ্রতা দূর হচ্ছে।

২০২৩ সালে বিশ্বের ১৩৭টি দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৩ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মীর যা দেশের ইতিহাসে এক বছরে বিদেশে যাওয়ার রেকর্ড। এসব কর্মসংস্থানের বেশিরভাগই হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছে সৌদি আরবে। দেশটিতে ১১ মাসে যায় ৪ লাখ ৫১ হাজার ৫০২ কর্মী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ কর্মী যাওয়া দেশ হচ্ছে মালয়েশিয়া ও ওমান। দেশগুলোতে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ লাখ ২৯ হাজার ৪৩১ ও ১ লাখ ২৫ হাজার ৯৬১ জন। সমসূত্র অনুযায়ী ২০২২ সালে বিদেশ যাওয়া কর্মীর সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার, ২০২১ সালে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯, ২০২০ সালে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ এবং ২০১৯ সালে ৭ লাখ ১৫৯ জন। প্রাসঙ্গিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গণমাধ্যমে বলেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা এবং শ্রমখাত নিয়ে সরকারের আন্তরিকতার কারণে রেকর্ড পরিমাণ কর্মী বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। সরকার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন নতুন শ্রমবাজার তৈরি করছে। আগামী বছর হয়তো এই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে ইউরোপের অনেক দেশে কর্মী যাচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে বেতন নিরাপত্তাসহ সবকিছু নিশ্চিত করে দক্ষ কর্মী পাঠাতে বেশি জোর দিতে চায় সরকার যাতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরও বাড়ানো যায়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বিবেচনায় বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত আয় দেশে বৈধ উপায়ে প্রেরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকার ১ জুলাই ২০১৯ হতে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকল্পে সরকার ১ জানুয়ারি ২০২২ হতে রেমিট্যান্সের বিপরীতে নগদ প্রণোদনার হার ২ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ধারাবাহিকতায় বৈধ উপায়ে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধিতে প্রবাসীদের সিআইপি সম্মাননা, প্রবাসী আয়ের বিপরীতে প্রণোদনা, রেমিট্যান্স আহরণ-বিতরণ প্রক্রিয়া দ্রুতকরণ, দেশে আবাসন খাতসহ বিশেষ বিনিয়োগ স্কিম চালু ও প্রশিক্ষিত লোক পাঠানোর মতো নানা ধরনের কর্মতৎপরতা অতিশয় দৃশ্যমান।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারিতে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার যা সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তা বেড়েছে ৮ শতাংশ। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে প্রবাসী আয় ৩ শতাংশ বেড়ে ১২ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা এ যাবৎকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলার। পূর্বে করোনাকালীন ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে সর্বোচ্চ রেসিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমটি) তথ্যানুসারে, এখন পর্যন্ত বছরভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসে ২০২১ সালে যার পরিমাণ ২ হাজার ২০৭ কোটি ডলার। ২০২২ সালে তা কমে হয় ২ হাজার ১২৯ কোটি ডলার এবং ২০২৩ সালে সামান্য বেড়ে তা দাঁড়ায় ২ হাজার ১৯১ কোটি ডলার। এছাড়া চলতি এপ্রিল মাসের প্রথম ৫ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৫ কোটি ৫৪ লাখ মার্কিন ডলার (৪৫৫ মিলিয়ন) যার মধ্যে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৩ কোটি ৮৫ লাখ, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ২ কোটি ৭৩, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৭৭ লাখ এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৭ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। কিন্তু জনশক্তি রপ্তানিতে মাইলফলক অর্জন সত্ত্বেও এর বিপরীতে বাড়েনি রেমিট্যান্স প্রবাহ। উল্লেখ্য যে, প্রবাসী আয় অর্জনে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য; এই ধরিত্রীর বিভিন্ন দেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অর্থ, রেমিট্যান্স যারা দেশে

পাঠাচ্ছে তাদেরকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাদের প্রতি বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতা-অভিযোগের অন্ত নেই। দালালের দৌরাত্ম্য, পাসপোর্ট জটিলতা, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশ নতুন কোন বিষয় না হলেও তার সাথে যুক্ত হয়েছে মৃত্যুর পর প্রবাসীদের প্রতি অবহেলাও। প্রবাসীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধি পেলেও তা প্রতিরোধে বা ঘটনা তদন্তে উদ্যোগী নয় দূতাবাসগুলো। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকেরা দেশে অধিকতর নিগৃহীত হচ্ছেন। বিমানবন্দরে নেমেই তারা অরাজক আচরণ-ভোগান্তিতে নিপতিত হয়। অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (বামারু) প্রতিবেদনেও প্রবাসী কর্মীদের নানান দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যমতে, উপসাগরীয় দেশগুলোতেই বেশি মৃত্যু হচ্ছে প্রবাসী কর্মীদের। বিদেশের মাটিতে অনেক প্রবাসীর দাফন হচ্ছে। কিন্তু এসব মৃত্যুর কারণ নিয়েও কখনো অনুসন্ধান করেনি মন্ত্রণালয়। মৃত্যু সনদে গণহারে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বা 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধে মৃত্যু' লিখে দেওয়ায় অর্ধেকের বেশি মৃত্যুর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এতসব উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট মহলের আমলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের (ডবিউইডবিউবি) বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে রেকর্ড ৪ হাজার ৫৫২ প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে এসেছে। ২০২২ সালে এসেছিল ৩ হাজার ৯০৪ মরদেহ। উল্লেখ্য সংস্থার ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে শুরু করে ২০২৩ পর্যন্ত মোট মরদেহ আসে ৫১ হাজার ৯৫৬ এবং গত ১০ বছরে আসে ৩৪ হাজার ৩২৩ প্রবাসী শ্রমিকের। ২০১৭ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত আসা ১৭ হাজার ৮৭১ মরদেহের ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশই এসেছে উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) আওতাভুক্ত ছয় দেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন থেকে।

এছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সর্বস্ব হারিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়ে শূন্য হাতে একপ্রকার ব্যর্থ হয়ে দেশে ফেরার দৃষ্টান্তও অনেক। ডবিউইডবিউবি'র পরিসংখ্যান মতে, ২০২৩ সালে শূন্য হাতে দেশে ফিরে আসা প্রবাসীর সংখ্যা ৮৬ হাজার ৬২১ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৮৩ হাজার ৭১৯ এবং নারী ২ হাজার ৯০২ জন। তবে সংস্থাটির নিকট পাসপোর্ট নিয়ে দেশে ফেরা প্রবাসীর কোন হিসাব নেই। অভিবাসন খাত সংশ্লিষ্টদের অভিমত, ব্যর্থ অভিবাসনের প্রকৃত চিত্র আরও নাজুক। বছরে এ সংখ্যা হতে পারে লাখের বেশি। দেশে ফিরে আসা ২১৮ প্রবাসীর ওপর রুমারু কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশে গিয়ে কোনো কাজ পাননি এমন কর্মীর সংখ্যা ১৫ শতাংশ এবং চুক্তি অনুসারে কাজ পাননি ২০ শতাংশ। ফলশ্রুতিতে এসব কর্মীর দেশে ফিরে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। উক্ত জরিপে অংশ নেওয়া কর্মীদের ১৫ শতাংশ বিদেশে যাওয়ার ১ মাসের এবং ২৯ শতাংশ কর্মী ৬ মাসের মধ্যে দেশে ফেরেন। অভিবাসন খাত বিশেষজ্ঞদের দাবি, যে ধরনের কাজে বাংলাদেশি কর্মীরা বিদেশে যাচ্ছেন, সেসব কাজের জন্য অন্যান্য দেশ থেকে দক্ষ কর্মীরা যাচ্ছেন। তাই বিদেশের কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মীদের চাহিদা কমছে। এই ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট যে, রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অধিকতর অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রচলিত সুবিধাদি পর্যাপ্ত নয়। তাদের দেশে থাকা মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান, সন্ততিসহ পরিবার পরিজনদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, ব্যাংক-বীমাসহ সরকারি-বেসরকারি সেবাখাতসমূহে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সুবিধাদির সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় বৈধ পথে নয়; বরং অবৈধ পথে বা হুন্ডি ও টাকা পাচারের কদর্য পন্থায় তাদের সৎ উদ্যোগকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার সমূহ সম্ভাবনা প্রবল।

লেখক : *শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

রেমিট্যান্স, অর্থপাচার ও হুন্ডির ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ফরেস্ট কুকসন

সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের জন্য গ্রাহকরা হুন্ডির ব্যবহার বাড়িয়ে দেওয়ায় হুন্ডি নেটওয়ার্কের সংখ্যাও বেড়েছে। ফলে হুন্ডি বাজার প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে এবং সব মিলিয়ে হুন্ডি পদ্ধতি আরও কার্যকর হয়ে উঠছে। আর গ্রাহকের এই হুন্ডি নির্ভরতা বেড়েছে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি নিষেধের কারণে

বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হওয়া নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও আলোচনা হয়। তবে আদতে যে প্রক্রিয়ায় অর্থপাচার হয় তা কখনও ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয় না। রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। এছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, যার ওপর সরকারের আর্থিক নীতিমালা অনেকাংশে নির্ভরশীল সেটি নিয়েও আলোচনা হয়। তবে এই সব বিষয় নিয়েই সাধারণত ভুলভাবে আলোচনা করা হয় এবং অর্থনীতির চিত্রকেও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো রেমিট্যান্স ও অর্থপাচারের আসল প্রক্রিয়াটা তুলে ধরা এবং এটা কিভাবে কাজ করে তা বোঝানো। এই আলোচনায় আমরা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টেরও একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবো।

হুন্ডি ব্যবসা

হুন্ডি ব্যবসা কীভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরুন, আসলাম সাহেব একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ভাবছেন কোনো একটি উন্নত দেশে গিয়ে একটু আয়েশ করে জীবনযাপন করবেন। তিনি অস্ট্রেলিয়াকে বেছে নিলেন। সেখানে তিনি এক লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি বাড়ি কিনতে চান। বিষয়টি তিনি একটি হুন্ডি নেটওয়ার্কের দালালকে জানালেন। দালাল তাকে ৯০ লাখ (১ ডলার = ৮৫ টাকা ধরে নেওয়া যাক) টাকা দিতে বললেন, যার মধ্যে হুন্ডি নেটওয়ার্কের ফিও অন্তর্ভুক্ত। দালালকে ৯০ লাখ টাকা দেওয়ার কিছুদিন পর আসলাম সাহেব দেখলেন যে তার সিঙ্গাপুরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১ লাখ মার্কিন ডলার জমা হয়ে গেছে। এবার সেটা তিনি নির্বিঘ্নে সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

এই টাকা তাহলে কোথা থেকে এসেছে? হুন্ডি নেটওয়ার্কের দালালরা আসলে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে ডলার কিনে নেয় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে (ধরুন, ১ ডলার = ৮২ টাকা)।

এবার চলুন আরেকটি দৃশ্যে যাওয়া যাক। কুমিল্লার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা তায়েব আলী দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে কর্মরত। তার অনেকদিনের স্বপ্ন মফস্বলে একটি পাকা বাড়ি করার। সেই লক্ষ্যে তিনি উদয়াস্ত খেটে কিছু টাকা জমিয়েছেন। এই টাকা তিনি বাড়িতে পাঠালে তার স্ত্রী সাবেরা বাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু করতে পারবেন। এখন টাকাটা সাবেরার কাছে পাঠানোর দু'টি উপায় রয়েছে। প্রথম উপায় হলো, তিনি টাকাটা সৌদি আরবের কোনো ব্যাংকে জমা দিবেন। ওই ব্যাংক তার অর্জিত সৌদি রিয়ালকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত করে বাংলাদেশের যে ব্যাংকে সাবেরার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেখানে পাঠিয়ে দেবে। বাংলাদেশের এই ব্যাংক নিজেদের ফি রেখে ডলারপ্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত টাকা হিসেব করে সাবেরাকে দিয়ে দেবে। তবে এই ব্যাংক থেকে টাকা

পেতে হলে সাবেরাকে ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় গিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে টাকাটা তুলতে হবে, যা ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা জটিলও বটে।

সাবেরার কাছে টাকা পাঠানোর দ্বিতীয় উপায় হলো হুন্ডি। তায়েব আলী হুন্ডি নেটওয়ার্কের সৌদি প্রতিনিধিকে টাকা দিলে, হুন্ডি নেটওয়ার্ক তায়েব আলীর দেওয়া অর্থ আসলাম সাহেবের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিলেন। এদিকে হুন্ডি নেটওয়ার্কের বাংলাদেশ প্রতিনিধি আসলাম সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া টাকা সাবেরাসহ আরও কয়েকজন প্রবাসীর পরিবারকে দিয়ে দিলেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, হুন্ডি থেকে টাকা পাওয়ার জন্য সাবেরাকে কোথাও যেতে হচ্ছে না। হুন্ডি নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিই তার বাড়িতে এসে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে, তাকে কোনো কাগজপত্রের ঝামেলার মধ্য দিয়েও যেতে হচ্ছে না। আরেকটি বিষয় এখানে স্পষ্ট যে, স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকের তুলনায় হুন্ডি নেটওয়ার্ক বেশি এক্সচেঞ্জ রেট বা বিনিময় হার দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যাংক যদি ডলারপ্রতি সাবেরাকে ৮৫ টাকা দেয়, তাহলে হুন্ডি হয়তো দিবে ৮৬ টাকা কিংবা আরেকটু বেশি। এই অতিরিক্ত টাকা দিয়েই প্রধানত হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলো তাদের গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে।

অবশ্য প্রবাসীদেরকে হুন্ডি ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে সরকারও বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করেছে। যেমন ব্যাংকের মতো বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারপ্রতি নির্ধারিত টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত ২.৫% বোনাস দেয়। অর্থাৎ কোনো প্রবাসী ব্যাংকের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স পাঠালে তার পরিবার ব্যাংক থেকে তুলতে পারবেন ১ লক্ষ আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু হুন্ডি নেটওয়ার্ক এসব প্রণোদনার সঙ্গে খুব দ্রুতই সমন্বয় করে গ্রাহকের জন্যে আরও বেশি বিনিময় হারের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ব্যাংকে গিয়ে লাইন ধরে যাবতীয় কাগজপত্র পূরণ করে টাকা তুলতে হয়। বিপরীতে হুন্ডি প্রতিনিধি নিজেই গিয়ে গ্রাহকের হাতে টাকা পৌঁছে দেন। এ বিষয়টিও প্রবাসী ও তাদের পরিবারকে হুন্ডি ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

মোদ্দাকথা, আসলাম সাহেব বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায় তার কাঙ্ক্ষিত বাড়িটি কিনতে পারছেন এবং সাবেরাও কোনোরকম ঝামেলা ছাড়া তার স্বামীর পাঠানো টাকা হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু আসলাম সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া বাংলাদেশি মুদ্রা সাবেরাকে দেওয়া হয়েছে এবং তায়েব আলীর কাছ থেকে নেওয়া মার্কিন ডলার আসলাম সাহেবের অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে, দেশ থেকে আসলে কোনো টাকাই বাইরে যাচ্ছে না। দেশের কোনো ব্যাংকে লেনদেনের কোনো রেকর্ড নেই। বিদেশের ব্যাংকগুলো হয়তো টাকার উৎস জানতে চাইতে পারে যদি সেটা অনেক হয়; কিন্তু তাও হয়তো করবে না যদি টাকার পরিমাণ তেমন না হয়।

হুন্ডি বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ

দেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ নির্ভর করে প্রবাসীদের সংখ্যা, বিদেশে তাদের আয় এবং সর্বোপরি দেশে তাদের পাঠানো টাকার পরিমাণের উপর। রেমিট্যান্সের এই অর্থ আবার ব্যাংকিং ও হুন্ডি চ্যানেলে কীভাবে ভাগ হবে, তা নির্ভর করে হুন্ডির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ওপর। পরিহাস হলো, হুন্ডিই এখানে প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলোর ছেড়ে দেওয়া অংশটাই মূলত ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আসে। হুন্ডি ব্যবস্থার বিস্তার রোধে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করলেও বাস্তবে সেগুলো কোনো কাজে আসছে না। হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলো মুদ্রা বিনিময়ের হার নিজেরাই নির্ধারণ করে বিধায় এটি রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ, সরকারের দেওয়া প্রণোদনা ও মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদার সঙ্গে সবসময় সমন্বয় করতে পারে। মাঝে মাঝে হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলোর লাভ খানিকটা কমে গেলেও খুব দ্রুতই তারা বিনিময় হার সমন্বয় করে নিজেদের লভ্যাংশ বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কতোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আসে আর কতোটা হুন্ডি পদ্ধতির মাধ্যমে আসে তা দেখার জন্য পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, গড়ে ৫৫% রেমিট্যান্সই আসছে হুন্ডির মাধ্যমে। ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে মাত্র ৪৫%।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স এসেছিল ১,৬৫০ কোটি ডলার। উল্লিখিত % অনুযায়ী, ওই বছর হুন্ডির রেমিট্যান্স হবার কথা ২,৪০০ কোটি ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত হুন্ডিতে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,০০০ কোটি ডলার। এই হিসেব থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, হুন্ডিতে আসা বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ সর্বনিম্ন ১,৭০০ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ২,৩০০ কোটি ডলার।

হুন্ডির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে কারণে

হুন্ডির সবচেয়ে বড় চাহিদা আসে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কমিয়ে দেখানো বা আন্ডার ইনভয়েসিং-এর জন্যে। দ্বিতীয় বৃহত্তম চাহিদা তৈরি হয় বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের কারণে, যারা তাদের বেতনের একটা বড় অংশ দেশে পাঠানোর জন্যে হুন্ডি ব্যবহার করেন। এরপরই রয়েছে ভারতীয় পণ্য, যার মূল্য অনেকাংশেই শোধ করা হয় হুন্ডির মাধ্যমে। এছাড়াও এদেশের বিপুল পরিমাণ মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা বা পর্যটনের জন্য ভারতে যান এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ তারা দেশ থেকে নিয়ে যান হুন্ডির মাধ্যমেই। এসব কারণে দেশে হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলো শুধু টিকেই থাকছে না, বরং দিন দিন তাদের চাহিদা বাড়ছে।

উপরের কারণগুলো খানিকটা ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে, চীন ও ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিং করা হচ্ছে। এমনকি জাপান থেকে গাড়িসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রেও তার দাম কম দেখানো হয়। আন্ডার ইনভয়েসিং করা হয় মূলত আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উচ্চ শুল্ক ফাঁকি দিতে, যার মধ্যে সাধারণ আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট, অ্যাডভান্সড ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ভোগ্যপণ্য আমদানিতে এই শুল্কের হার ৪০%। এই বিরাট শুল্কের বোঝা এড়াতে আমদানিকারকরা পণ্যের দাম কমিয়ে দেখান। দেশের আমদানিকারকদের বড় একটি অংশ তাদের আমদানি করা পণ্যের মূল্যের কিছু অংশ পরিশোধ করেন লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) দিয়ে এবং বাকি অংশ ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। এলসি হলো আমদানির মূল সরকারি দলিল, যা আমদানি করা পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অন্যদিকে, ব্যাংক ট্রান্সফার পরিচালিত হয় হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে। ফলে এই লেনদেনের ব্যাপারে জানা বাংলাদেশ ব্যাংক ও কাস্টমসের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ ঋণপত্রের মাধ্যমে পরিশোধিত মূল্যই আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত মূল্য হিসেবে দেখানো হয় এবং সেই অনুযায়ীই আমদানিকারকরা সরকারকে শুল্ক প্রদান করেন।

এই দুর্নীতি ঠেকাতে সরকার কাস্টমস প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন (পিএসআই) সংস্থাগুলোকে নিয়োগ করেছিল। তাদের তদন্তে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের ব্যাপক আলামত ধরা পড়ে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আলামত কখনোই সামষ্টিক অর্থনীতির সঠিক চিত্র পেতে ব্যবহার করা হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে এটা খুব একটা জরুরি নয়। অথচ পিএসআই তথ্য অনুযায়ী, চীন থেকে আমদানির প্রকৃত পরিমাণ রেকর্ডকৃত আমদানির চেয়ে ৫০%; এবং ভারতের ক্ষেত্রে ৩০% বেশি। শুধু ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই এ দুই দেশ থেকে সরকারি রেকর্ডের বাইরে ৯০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে। আর সব মিলিয়ে মোট আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের পরিমাণ প্রায় ১,৩০০ কোটি ডলার। পিএসআই সংস্থাগুলো নিযুক্ত থাকাকালীন তাদের সংশোধন করা আমদানি মূল্য অনুযায়ীই কর ধার্য করতো এনবিআর। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমদানি মূল্য হিসেবে কোম্পানিগুলোর ঘোষণা করা মূল্যে পরিবর্তন আনা হয়নি কখনোই।

হুন্ডির দ্বিতীয় বৃহত্তম চাহিদা তৈরি হয় দেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের নিজ নিজ দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে। এদের বেশিরভাগই টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করেন। এই বিদেশি কর্মীদের বেতন তাদের দেশে নিয়ে গেলে তার প্রভাব বাংলাদেশের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে দেখতে পাওয়ার কথা। বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় কর্মীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় কোনো হিসেবই নেই। বিদেশি কর্মীদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেশ আলোচিত একটি বিষয়। প্রচলিত ধারণামতে, এর পরিমাণ বছরে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার। তবে এটি সম্ভবত সর্বনিম্ন অংক।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের বিষয়টি অনুমান করা খুবই কঠিন। যদিও এ ধরনের বাণিজ্যের অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া সর্বজনবিদিত। ধারণা করা যায়, ভারত থেকে বাংলাদেশে বছরে গড়ে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়। বিভিন্ন সমীক্ষা

অনুযায়ী আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি ডলার বলে অনুমান করা যায়।

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বহুসংখ্যক মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা ও পর্যটনের জন্য ভারতে যান। শুধু ২০১৯ সালেই প্রায় ২৬ লক্ষ বাংলাদেশি ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় ভারতীয় রুপির বিশাল একটি অংশ তারা পেয়েছেন হুন্ডির মাধ্যমে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতে মোট ১৭০ কোটি ডলারের চাহিদা ছিল বলে আমাদের অনুমান।

সব মিলিয়ে ২০১৮-১৯ সালে দেশের হুন্ডি বাজারে মোট ২,১০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদা চিহ্নিত করেছি। আমাদের ধারণা, এ চাহিদার পরিমাণ ১,৮০০ থেকে ২,৫০০ কোটি ডলারের মধ্যে ওঠানামা করে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে চার ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আমাদের ধারণা, হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বছরে গড়ে প্রায় ২,০০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ টাকা পাঠান। তবে এই অর্থের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১,৭০০ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ২,৩৬০ কোটি ডলারও হতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে বাইরে যায় বছরে গড়ে প্রায় ২,১০০ কোটি ডলার। তবে এই পরিমাণ ১,৮০০-২,৫০০ কোটি ডলারের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে।

১। উল্লিখিত টাকার পরিমাণ থেকে বোঝা যায় যে, হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ তুলনামূলক কম। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমদানি করা মূলধনী পণ্যের ওভার ইনভয়েসিং করাও টাকা পাচারের বড় একটি মাধ্যম, তবে সেক্ষেত্রে হুন্ডি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ সচ্ছল বাংলাদেশিদের একটা বড় অংশই হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার করে থাকেন। এই পাচার করা অর্থের পরিমাণ বছরে ৬০ কোটি থেকে ১০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ প্রতি বছর ৫০,০০০ ডলার করে পাঠান।

২। করোনাভাইরাস মহামারির প্রাদুর্ভাবের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণপত্রের হিসেবে আমদানি ব্যয় কমেছে ৫৩০ কোটি ডলার। এ সময় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ১৮০ কোটি ডলার। আমদানি ব্যয় কমার কারণে আন্ডার ইনভয়েসিং হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে হুন্ডির চাহিদাও। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরেও আমদানি ছিল ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২৭০ কোটি ডলার কম। একই বছর বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ৭৬০ কোটি ডলার। আমদানি কমে যাওয়ার সঙ্গে রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বগতির আপাতভাবে কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এই পরিবর্তন দিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার হ্রাসের বিষয়টি বোঝা যায়। সম্ভবত করোনাকালীন বিধি-নিষেধের কারণে আমদানি কমার কারণে হুন্ডি নেটওয়ার্কগুলোর জন্য কাজ করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। হুন্ডি ব্যবস্থার এই দুর্বলতার জন্যে রেমিট্যান্স খাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এছাড়া, করোনাকালে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা নাজুক হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে হয়তো বিদেশে থাকা তাদের স্বজনরা রেমিট্যান্স পাঠানো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অর্থনীতির বিচারে ২০২০-২১ অর্থবছর ছিল একটি অস্বাভাবিক সময়।

৩। ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সামগ্রিক চিত্রের ওপর হুন্ডির প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আমদানি ব্যয় ও রেমিট্যান্সের অনানুষ্ঠানিক পরিমাণও মোট হিসেবে যুক্ত করা গেলে তা চলতি হিসেবে খুব একটা পরিবর্তন আনবে না এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের একই রকম অবস্থা থাকবে। তবে অনানুষ্ঠানিক হিসেব যোগ করলে আমদানি ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। তাতে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাবে। প্রবাসীদের দেশে পাঠানো টাকার একটি অংশ তাদের পরিবারের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়, একটি অংশ বিভিন্নভাবে জমা করা হয়, এবং আরেকটি অংশ জমিয়ে তা কোনো সম্পদ কিনতে ব্যয় করা হয় (জমি কেনা বা বাড়ি তৈরি)। দৈনন্দিন ব্যয় ও বিনিয়োগ খাতে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকসের (বিবিএস) দেওয়া হিসেবকে সঠিক ধরে নিলে অতিরিক্ত আমদানি ব্যয় সরাসরি জিডিপির অংককে কমিয়ে দেবে। যেমন, এই হিসেব ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপিকে ৩% কমিয়ে দেবে। অবশ্য জিডিপি কমে যাওয়ার মানে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া নয়। কারণ তাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপিও কমে যাবে। কারণ সে সময় আমদানিকৃত বহু পণ্যকে দেশজ উৎপাদন হিসেবে ধরা হয়েছিল।

৪। আমাদের ধারণা, ২০২১-২২ অর্থবছর ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। কারণ পুনরায় আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্ডার ইনভয়েসিংও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দিন শেষে হুন্ডি ব্যবস্থাকে আগের মতো গতিশীল করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বৈধ চ্যানেলে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০০ কোটি ডলার কম ছিল। আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও টাকার মান কমে যাওয়ার ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে; সেইসঙ্গে আন্ডার ইনভয়েসিংও বৃদ্ধি পাবে।

হুন্ডি ব্যবস্থা কি উপকারী?

এখানে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করে বিচারের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। বৈশ্বিক বাজার ব্যবস্থাপনার বিশাল একটি অংশ বিভিন্ন কারণে হুন্ডির ওপর নির্ভরশীল। হুন্ডির অবর্তমানে এই বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই নমনীয়তা কমে যাবে। যেমন, ভারতে প্রচুর বাংলাদেশি যাওয়ায় এবং দুই দেশের মধ্যকার অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের ফলে দুই দেশের বহু মানুষ নানাভাবে লাভবান হচ্ছেন।

হুন্ডি ব্যবস্থা না থাকলে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োগ দেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে যাবে এবং কমে যাবে। তখন তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা যুক্তি দেখাতে পারেন যে, দেশে উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা হাতেগোনা বিধায় ভারতীয় বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োগ করা গোটা শিল্পের টিকে থাকার জন্যই জরুরি।

দেশের শুল্ক ব্যবস্থা শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যই উৎপাদন করতে উৎসাহিত করে এবং রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। হুন্ডি ব্যবস্থায় খরচ শুল্কহারের তুলনায় কম হওয়ায় তা সরকারি বাণিজ্য নীতির তোয়াক্কা না করে উদ্যোক্তাদেরকে রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহিত করতে পারে। কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য রপ্তানিভিত্তিক বাণিজ্য জরুরি এবং

রাজনৈতিকভাবে সরকারের রপ্তানি বিরোধী বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করা অসম্ভব, তাহলে তার উচিৎ হুন্ডি ব্যবস্থাকে রপ্তানি ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে মেনে নেওয়া। হুন্ডি ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে বেশ খানিকটা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার আরেকটা সুবিধা হলো, এর মাধ্যমে আমদানি করা পণ্যের দাম বৈধভাবে আমদানিকৃত পণ্যের দামের চেয়ে কম হয়। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের ভোক্তারাও কম দামে পণ্য কিনতে পারেন। এতে তাদেরও উপকার হয়। তবে হুন্ডি ব্যবস্থা সরকারের রাজস্ব আয় ব্যাপকভাবে (জিডিপি'র ০.৭৫-১.০% পর্যন্ত) কমিয়ে দেয়।

এবার পাঠক দুটি ফলাফলের তুলনামূলক বিচার করে দেখতে পারেন। এক, হুন্ডি ব্যবস্থাকে সংকুচিত করার ফলে সরকারি ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য দুটোই বৃদ্ধি পাবে। দুই, হুন্ডি ব্যবস্থাকে আরও বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার ফলে সরকারি ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য দুটোই কমে যাবে।

সরাসরি পাচার: উপরে বলেছিলাম যে হুন্ডির মাধ্যমে সরাসরি পাচার হওয়া টাকার পরিমাণ খুবই নগণ্য (বছরে ৬০-১০০ কোটি ডলার)। কারণ সরাসরি অর্থপাচার না করলেও হুন্ডি ব্যবস্থার চাহিদা ও যোগান দুটোই ভারসাম্যাবস্থায় থাকে।

এবার চলুন অর্থ পাচারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে কথা বলা যাক।

১। প্রতারণা: ধরা যাক, বাংলাদেশের একটি কোম্পানি বিদেশের একটি কোম্পানির কাছ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করবে এই মর্মে এলসি বা ঋণপত্র খোলা হলো। কিন্তু বাস্তবে এই দুটো কোম্পানির কোনটিরই অস্তিত্ব নেই। ব্যাংক ঋণপত্র অনুযায়ী বিদেশের সেই ভুয়া কোম্পানিকে টাকা পাঠিয়ে দিলে প্রতারক আমদানিকারক বড় অংকের ঋণের বোঝা ব্যাংকের ঘাড়ে চাপিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। স্বস্তির বিষয় হলো, এ ধরনের প্রতারণার সংখ্যা এখনো যথেষ্ট কম।

২। মূলধনি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেখানো বা ওভার ইনভয়েসিং: বহু মূলধনি পণ্যের ওপর কোনো আমদানি শুল্ক নেই। থাকলেও তা নামমাত্র। এছাড়া মূলধনি পণ্য অনেক বেশি পরিমাণে আসে না তাই তার প্রকৃত দাম নিরূপণ করা কাস্টমসের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। সে কারণে আমদানি করা মূলধনি পণ্যের ইনভয়েসে অতিরিক্ত দাম দেখানোর পরও কাস্টমস খুব একটা সন্দেহ করে না। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ৫০০ কোটি মূলধনী পণ্য আমদানি করার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত দামের তুলনায় গড়ে ২৫% ওভার ইনভয়েসিং উচ্চ সীমা বলে ধরে নেওয়া যায়। সেই হিসেবে এইভাবে অর্থ পাচারের পরিমাণ ১২৫ কোটি ডলারের বেশি নয়।

৩। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আন্ডার ইনভয়েসিং: ধরা যাক, বাংলাদেশের একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ক' নামে তাদের একটি শাখা স্থাপন করলো। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ক্রেতা প্রয়োজনীয় অর্ডারের জন্য ক-এর সঙ্গে চুক্তি করলো। অর্ডারের জন্য 'ক' বাংলাদেশী একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করলো। এই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আসলে 'ক'-এরই মূল প্রতিষ্ঠান। তবে এই 'ক' তার মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে দামে চুক্তি করেছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি করা দামের চেয়ে কম। এই চুক্তির আমদানি-রপ্তানি ও যাবতীয় লেনদেন শেষে দেখা গেলো যে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ 'ক'-এর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী মূল প্রতিষ্ঠান তার আয়ের একটা অংশ কৌশলে

যুক্তরাষ্ট্রে জমা করেছে। অবশ্য দেশের বেশিরভাগ পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় অর্থ পাচারের এই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর না। তবে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার খুবই দ্রুত দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ধস নামাতে পারে।

সংক্ষেপে এই চারটি মাধ্যম ও পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ সাজালে দেখা যায়-

১। সরাসরি হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার বছরে ৬০ থেকে ১০০ কোটি ডলার।

২। মূলধনি পণ্যের ওভার ইনভয়েসিংয়ের পরিমাণ বছরে ১২৫ কোটি ডলার।

৩। দুটি ভুয়া কোম্পানির মধ্যে লেনদেন দেখিয়ে অর্থপাচার করা। মোট পাচারকৃত অর্থের তুলনায় এই মাধ্যমে পাচার করা অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট কম বলেই আমাদের বিশ্বাস।

৪। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আন্ডার ইনভয়েসিং। এই মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণও সীমিত।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে পাচার করা অর্থের পরিমাণ সম্ভবত বছরে ২০০ থেকে ৩০০ কোটির বেশি নয়।

অর্থপাচার রোধে করণীয়

১। আমদানি করা মূলধনি পণ্যের চালান আসার আগেই পিএসআই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সেসব পণ্যের প্রকৃত দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

২। ইনভয়েসে উল্লিখিত বিদেশি ক্রেতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে বিজিএমই এর কাছ থেকে সেই ক্রেতার ব্যাপারে প্রত্যয়নপত্র নেওয়া এবং নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজের সঙ্গে রপ্তানি করা পণ্যের দাম মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়া। এছাড়া পিএসআই সংস্থাগুলোরও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে যাচাই করার সক্ষমতা রয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো ৫০ হাজার কোটি ডলারের অর্থনীতি থেকে বছরে ০.৫% বা ২৫০ কোটি ডলার পাচার ঠেকানো বেশ কঠিন কাজই বটে।

লেখক:

ফরেস্ট কুকসন একজন অর্থনীতিবিদ যিনি বাংলাদেশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের (AmCham) প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন।

অফশোর ব্যাংকিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা

নিরঞ্জন রায়

দেশে অফশোর ব্যাংকিংকে আইনগত ভিত্তি দিয়ে এই বিশেষ ধরনের ব্যাংকিং সেবার প্রসার ঘটানোর কার্যক্রম বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেশের অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক সীমিত পরিসরে অফশোর ব্যাংকিং চালু রাখলেও এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। এই প্রথমবার সরকার এসংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করেছে। গত ৫ মার্চ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে 'অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪' পাস হয়েছে।

উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা কোনো ব্যবসা যদি করতেই হয়, তাহলে সেটি আইনের মধ্যে থেকেই করা ভালো।

অফশোর ব্যাংকিং আইনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে. অফশোর ব্যাংকিংয়ের ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; ২. অনিবাসি বাংলাদেশি দেশে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ করতে পারবে; ৩. ইউএস ডলার ছাড়াও একাধিক আন্তর্জাতিক মুদ্রায় অফশোর ব্যাংকিং হিসাবে লেনদেন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যথা-লেটার অব ক্রেডিট বা এলসি, ব্যাংক গ্যারান্টি, এক্সপোর্ট ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশন বা ডিসকাউন্ট সহজ হবে; ৫. বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বা ফিন্যান্সিং এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে; ৬. অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত সুদ বা মুনাফা হবে আয়করমুক্ত; ৭. অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করলে বিদেশিদের অর্থ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না এবং ৮. অর্থনৈতিকভাবে দেশ লাভবান হবে এবং দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

অফশোর ব্যাংকিংয়ের মতো সীমিত পরিসরের ব্যাংকিং সার্ভিস আইনের মাধ্যমে চালু করে একটি দেশের আর্থিক খাত এবং অর্থনীতি যে এত ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে, তা আমাদের জানা ছিল না।

বাংলাদেশ অফশোর ব্যাংকিংকে আইনগত ভিত্তি দিয়ে এই সেবার প্রসার ঘটিয়ে বহুমাত্রিক সুবিধা নিশ্চয়ই ঘরে তুলতে পারবে এবং আমরাও তেমনটা আশা করি। তবে এতসব ছাড়িয়ে এই অফশোর ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের স্বপক্ষে যে যুক্তিটি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা হচ্ছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি। এ কথা ঠিক যে এই আইন দ্রুত প্রণয়নের ক্ষেত্রে রিজার্ভ বৃদ্ধির যুক্তি জাদুর মতো কাজ করে থাকতে পারে। কেননা দেশে ডলার সংকট বিরাজ করছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একসময়ের ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি চলে এসেছে।

ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে পারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন যত সহজে সম্ভব, তা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হবে না।

অফশোর ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করে এই বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবসার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে এতসব আর্থিক লাভ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে কি না বা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সেভাবে বৃদ্ধি পাবে কি না, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে অফশোর ব্যাংকিং সুবিধা অবারিত করার মাধ্যমে দু'টি বিশেষ সুবিধা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এর একটি হচ্ছে বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার সুযোগ এবং আরেকটি হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের সুযোগ। তবে দুটি ক্ষেত্রেই সুবিধা যেমন আছে, তেমনি অসুবিধা অনেক অসুবিধাও আছে।

বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত কিছু ঝুঁকির বিষয় আছে, যা সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের; যদিও এই হাজার হাজার কোটি টাকা কিভাবে, কোন মাধ্যমে এবং কোন দেশে পাচার হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ দিয়ে কাউকে অভিযোগ করতে দেখিনি। সবাই এক ধরনের ঢালাও বক্তব্য দিয়ে থাকে। তবে দেশ থেকে বিশাল একটি অঙ্কের অর্থ যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে গেছে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। অন্তত কানাডার কথিত বেগমপাড়া, অনেক উন্নত দেশে কিছু বাংলাদেশির বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক বছরে ১২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানিমূল্য দেশে না আসার তথ্য সে সাক্ষ্যই দেয়। অনেক নেতিবাচক সমালোচনা সত্ত্বেও যদি অবৈধভাবে পাচার হওয়া অর্থের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দেশে কোনোভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, তাহলে দেশ লাভবানই হবে। আর এই কাজটি অফশোর ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহার করে খুব সহজেই করা সম্ভব। কেননা অফশোর ব্যাংকিং হিসাবে অর্থ জমা রাখলে সেই অর্থ কোনো রকম পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই বিদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে যেসব অনিবাসি বাংলাদেশি অবৈধভাবে অর্থ বিদেশে নিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অনেকে সেই অর্থ দেশের অফশোর ব্যাংকিং হিসাবে রাখতে আগ্রহী হবেন।

অবশ্য এভাবে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ দেশে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হলেও এই অর্থ দেশে সেভাবে দীর্ঘদিনের জন্য থাকবে না এবং দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সেভাবে সম্পৃক্ত হবে না। মূলত এই অর্থ বিদেশের কোনো ব্যাংক হিসাবে থাকার পরিবর্তে দেশের কোনো ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং হিসাবে থাকবে এবং সুযোগমতো আবার বিদেশে ফিরে যাবে। এ কারণেই বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ

ফিরিয়ে এনে দেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের সুযোগ খুব একটা কাজে লাগানো যাবে না। উল্লেখ্য, যাঁরা দেশ থেকে অবৈধভাবে বিদেশে অর্থ নিয়ে গেছেন, তাঁদের অনেকেই উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করতে না পারায় সেখানে সেই অর্থ বেশিদিন ধরে রাখতে পারছেন না। অনেকে বিকল্প হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ খুব সহজেই দেশে ফিরে আসতে পারে যদি উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অফশোর ব্যাংকিং সুবিধা অবারিত করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ এবং অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেননা বিশ্বে যাদের হাতে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের জন্য আছে, তারা এ রকম সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তাদের খুব অল্প সুদে বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহের সুযোগ আছে। ফলে সেসব প্রতিষ্ঠান যদি কিছু অধিক সুদে অর্থায়ন বা ঋণদানের সুযোগ পায়, তাহলে তারা সেই সুযোগ লুফে নেয়। এ কারণেই অফশোর ব্যাংকিং চালু করে খুব সহজেই বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন বা ঋণ পেতে পারে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এই ধরনের অর্থায়ন বা ঋণ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি বা চাহিবা মাত্র ফেরত দেওয়ার শর্তে প্রদান করা হয়। আর এ রকম অর্থায়ন বা ঋণ নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করলে অথবা এমন খাতে বিনিয়োগ করা হলো, যেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় রেভিনিউ উপার্জনের সুযোগ নেই, তাহলে সেই ঋণ খেলাপি হওয়া বা ডিফল্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, যা দেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে এশিয়ার উদীয়মান বাঘ হিসেবে পরিচিত দেশ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এভাবে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে কী ভয়ংকর বিপদে পড়েছিল, তা আমাদের সবারই জানা। এ কারণেই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সে জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অর্থায়ন বা ঋণ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কঠোর শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। বৈদেশিক মুদ্রার অর্থায়ন বা ঋণ নিয়ে সেসব খাতেই বিনিয়োগ করা যাবে, যে খাতের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বেশির ভাগ বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে রপ্তানি করা হবে। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে দেশীয় মুদ্রায় বিক্রির জন্য পণ্য উৎপাদনে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা অর্থায়ন বিনিয়োগের কোনো রকম সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

যেমনটা আশা করা হচ্ছে, তাতে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যদি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি হয়ও, তবে তা স্থিতিশীল রিজার্ভ হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা অফশোর ব্যাংকিং সুবিধার সুযোগ নিয়ে যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসেও, তবে সেই অর্থ আবার যেকোনো সময় দেশ থেকে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবেই। ফলে এই বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধার কারণে সাময়িক ডলার সরবরাহ বাড়লেও যেকোনো সময় আকস্মিক কমে যেতে পারে, যা দেশকে তাৎক্ষণিক এক সংকটে ফেলে দেবে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আগামী দুই বছরে দেশে ৮০ বিলিয়ন ডলার আসবে এবং এই বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অংশ হিসেবে দেখানোর সুযোগ আছে কি না, আমার জানা নেই এবং থাকলেও সেটি হবে ভয়ংকর বিপজ্জনক। কেননা পরে যেকোনো সময় এই বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে চলে যেতে পারে। অফশোর ব্যাংকিং হিসাবে টাকা রাখা মূলত ব্যাংকের এফসি (ফরেন কারেন্সি) হিসাবে টাকা রাখার সমতুল্য। কেননা এফসি হিসাবে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় যেকোনো দেশে পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তর করতে পারেন। এ কারণেই এফসি হিসাবের উদ্বৃত্ত রিজার্ভের অংশ করার সুযোগ নেই।

অফশোর ব্যাংকিং আইন সাময়িক কিছু ডলার সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করলেও দেশে ডলার সংকট যে তীব্র এবং দীর্ঘমেয়াদি আকার ধারণ করেছে, তা উত্তরণের সুযোগ খুবই কম। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটতে হবে। ব্যাপক হারে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক হারে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির আওতায় আনতে হবে। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রপ্তানি করার মতো অসংখ্য অপ্রচলিত পণ্য আমাদের দেশে যেমন আছে, তেমনি বিশ্বের অনেক স্থানে নতুন নতুন রপ্তানি বাজারও সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজন শুধু এই সুযোগ কাজে লাগানো এবং এ জন্য আমাদের রপ্তানি পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করতে হবে। বিদেশের আমদানিকারক দেশে এসে রপ্তানি আদেশ দেবে, এই অপেক্ষায় বসে না থেকে বিদেশের রপ্তানিকারকের কাছে স্ব-উদ্যোগে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যা মূলত আধুনিক রপ্তানি পদ্ধতি। এর পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে দেশে এনে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মোটকথা, আমাদের বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ মোট বার্ষিক আমদানির চেয়ে বেশি না হলেও সমান করতেই হবে। এটি করতে পারলেই ডলারের চাহিদা স্বাভাবিক হবে এবং মূল্যও স্থিতিশীল থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সে পথেই অগ্রসর হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক : *সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা*

রেমিট্যান্সের ইনফ্লো ও আউটফ্লো

ড. মাহবুব উল্লাহ্

গত ২৯ জুন দৈনিক যুগান্তর বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণের তুলনামূলক চিত্র নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'রেমিট্যান্সের চেয়ে বিদেশিদের বেতনভাতা তিনগুণ'। গত কিছুদিন ধরে ডলার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আলোচনা জোরদার হয়ে উঠেছে। এটি হলো বাংলাদেশের কর্মজীবীরা বিদেশে কাজ করে তাদের আয় থেকে কী পরিমাণ ডলার দেশে রেমিট্যান্স হিসাবে পাঠায়। এর পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে বিদেশি কর্মী ও কর্মকর্তারা বাংলাদেশে কাজ করে কী পরিমাণ ডলার তাদের নিজ নিজ দেশে রেমিট্যান্স হিসাবে পাঠায়। এ দুয়ের হিসাব দিয়েই নির্ধারিত হয় রেমিট্যান্স বাবদ নিট কত ডলার বাংলাদেশ আয় করতে পারছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কথায় কথায় বলি, আমাদের দেশের মেহনতি মানুষ ও অন্যান্য কর্মী বিদেশে কাজ করে যে রেমিট্যান্স দেশে পাঠায়, তা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এতে খুব উৎফুল্ল হওয়ার সুযোগ নেই। দেখতে হবে অন্যান্য দেশের কর্মী ও কর্মকর্তারা বাংলাদেশে এসে চাকরি করার সুবাদে কী পরিমাণ ডলার নিজ নিজ দেশে বাংলাদেশ থেকে পাঠায়। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের মধ্যে ভারতীয় কর্মীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

২০১৫ সালের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) তথ্যমতে, বাংলাদেশ ছিল ভারতের প্রবাসী আয়ের তৃতীয় উৎস। টিআইবির তথ্যমতে, প্রতিবছর ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি অবৈধভাবে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছেন বিদেশিরা। বাংলাদেশে এনজিও, আইটি এবং গার্মেন্টসহ প্রায় ৩২টি ক্ষেত্রে চাকরি করছেন বিদেশিরা। পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের দেশে ভারত ও শ্রীলংকানদের চাহিদা প্রচুর। বিভিন্ন কারণে এ চাহিদা তৈরি হয়েছে। সেটা হতে পারে পেশাগত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার কারণে। তারা আমাদের দেশীয় কর্মকর্তাদের তুলনায় বেশি বেতনভাতা পায় তাদের কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার কারণেই। টিআইবি'র তথ্যমতে, বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকরা প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ২৬ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন।

অন্য একটি গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫ লাখ বিদেশি কর্মরত রয়েছেন। এ পরিমাণ জনশক্তি প্রতিবছর ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ নিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজ দেশে, যা থেকে খুব অল্প পরিমাণ রাজস্ব পাচ্ছে সরকার। অথচ এসব বিদেশির আয়ের ৩০ শতাংশ কর নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। কেননা বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি নাগরিকরা তাদের প্রকৃত বেতনভাতা গোপন করছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করছেন এদেশের নিয়োগকারী সংস্থা। এ কারণে এনজিওতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের সত্যিকারের বেতনের চিত্র উঠে আসে না। ফলে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার।

যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রবাসীদের দেশে পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহের তিনগুণের বেশি অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ থেকে বেতনভাতা বাবদ নিয়ে গেছেন বিদেশি কর্মীরা। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে সোয়া ১১ গুণ। একই সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতা নিজ দেশে বৈদেশিক মুদ্রায় নেওয়ার হার বেড়েছে ৩৭ গুণ। অর্থাৎ বাংলাদেশে বিদেশ থেকে আসা রেমিট্যান্স Inflow যে হারে বেড়েছে, তার তুলনায় বহুগুণ হারে

বেড়েছে বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স outflow । এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ছে। শুধু ২০২৩ সালেই বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশ থেকে বেতনভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় নিয়েছেন ১৫ কোটি ডলার, ওই সময়ে ডলারের দাম অনুযায়ী ১৬৫০ কোটি টাকা। বৈধভাবে নেওয়ার চেয়ে আরও বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। এর মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচারের নজিরও রয়েছে। অতি সাম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানো ও রেমিট্যান্স আসার চিত্র তুলে ধরা হয়।

সরকারের সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশে অবস্থানরত বৈধ বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭ হাজার ১৬৭। এর মধ্যে ভারতীয় নাগরিকরাই বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীনের নাগরিক। ভারতীয় ৩৭ হাজার ৪৬৪ এবং চীনের ১১ হাজার ৪০৪ জন। বাকিরা অন্যান্য দেশের। তাদের বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত। এর বাইরে অবৈধভাবে আরও অনেক বিদেশি আছেন, যাদের হিসাব এর মধ্যে নেই।

নির্ভরযোগ্য অনুমান হলো, বাংলাদেশে ৫ লাখ বিদেশি নাগরিক কর্মরত আছেন। অর্থাৎ বৈধভাবে থাকা বিদেশি নাগরিকদের তুলনায় বৈধ ও অবৈধ হিসাবে থাকা বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ।

বাংলাদেশের যে বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক কর্মী অবৈধভাবে অবস্থান করে চাকরি করছে, তারা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না, তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। এদের অনেকে অপরাধমূলক কর্মকান্ড, যেমন: মানব পাচার ও মাদক আমদানির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এমনকি এদের অনেকে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে। এভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিকরা বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষ শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু এদের বেশির ভাগই বেকার। এর পাশাপাশি আমরা যখন দেখি ৫ লাখ বিদেশি নাগরিক বৈধ ও অবৈধভাবে এদেশে কাজ করছে, তাতে বোঝা যায়, বিদেশিরা বাংলাদেশিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে শ্রমবাজারে অবস্থান করছে। যেসব বাংলাদেশি নতুন করে প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, তাদের একটি বিরাট অংশ শিক্ষিত বেকার। কেন তারা চাকরি পাচ্ছে না, এর একটি বড় কারণ হতে পারে তাদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে তাদের ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও লেখার দক্ষতা খুবই নিম্নমানের। পোশাকশিল্পের মতো রপ্তানিমুখী শিল্পে যে ধরনের বড়, মাঝারি ও নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপক প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা খুবই জরুরি। এদিক থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী ও বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগপ্রার্থীরা নিয়োগের জন্য নিয়োগকর্তাদের কাছে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার মান ক্রমাগতভাবে নিম্নগামী। এ অবস্থায় শিক্ষার মানবৃদ্ধি করা এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করাই উচিত শিক্ষার লক্ষণ। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দেশে নানামুখী বিপর্যয় দেখা দেবে।

আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করলে আয়কর প্রদান ও ওয়ার্ক পারমিট নেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশে কাজ করতে হলে বিদেশিদের এ-থ্রি ভিসা নেতে হয়। ২০০৬ সালে প্রণীত ভিসা নীতিমালা সংশোধন করে প্রকল্পে কাজ করলে এ-থ্রি ভিসা নেওয়ার বিধানটি তুলে দেওয়া হয়। ফলে ওই সময়ের পর থেকে এ-থ্রি ভিসা ছাড়াই বিদেশি কর্মীরা কাজ করতে পারছেন। এতে দেশে আসা বিদেশিদের কাজের ধরন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সরকারের কোনো সংস্থার কাছে নেই। তবে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়ার বিষয় হলো, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিদের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য জানা গেছে যুগান্তরের প্রতিবেদন থেকে।

বৈধ বিদেশি কর্মীরা যেমন বাংলাদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, তেমনই অবৈধ কর্মীরা হুন্ডির মাধ্যমেও রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে টস্কফোর্সের এক তদন্তে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উচ্চতর বেতনভাতা দেওয়ার নামে দেশ থেকে টাকা পাচারের ঘটনা ধরা পড়েছে। এমন ঘটনাও ধরা পড়েছে, বিদেশি কর্মী নেই, অথচ তার নামে বিদেশে বেতন-ভাতা পাঠানো হচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলে। বোঝা গেল, ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করলেও তা বৈধ নাও হতে পারে। দেশ থেকে কী দারুণ বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অর্থ পাচার করা হয়, তা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানো ও রেমিট্যান্স আসার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে ৩৭.২৬ গুণ। একই সময়ে বিদেশ থেকে প্রবাসীদের বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে ১১.২৬ গুণ। আলোচ্য সময়ে দেশে আসা রেমিট্যান্সে ৩ গুণের বেশি বেড়েছে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা নেওয়ার প্রবণতা। বছরভিত্তিক হিসাবেও দেখা যাচ্ছে, রেমিট্যান্সের চেয়ে বেশি বাড়ছে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নেওয়ার পরিমাণ। বাংলাদেশে এখন বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর সুবাদে বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে এসে কাজ করার সুযোগও বাড়ছে। বর্তমানে বিদেশি কর্মীরা যে বেতনভাতা পান, এর ৭৫ শতাংশ তারা নিজ দেশে বা অন্য কোনো দেশে বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠাতে পারেন। মোদ্দা কথা, বাংলাদেশ থেকে বিদেশি নাগরিকদের রেমিট্যান্স নিজ দেশে বা অন্য দেশে পাঠানোর প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের নিট রেমিট্যান্স আয় ঋণাত্মক হয়ে পড়ছে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যোগান

অজয় দাশগুপ্ত

আমরা জানি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিট্যান্স। অধিক বেতন, উন্নত কর্মপরিবেশ ও জীবনযাপনের আশায় মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমায়। এসব প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্স একটা দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে। রেমিট্যান্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাথাপিছু আয় এবং মোট জিডিপিও বৃদ্ধি পায়। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী আয়ের অর্থ দেশের দারিদ্র্যমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে।

একটি বিস্মৃত কাঠামোয় বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির অভিবাসনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের একটি গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটছে মনে হয়। বর্তমানে আমাদের মোট অভিবাসনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে শ্রমিকের অস্থায়ী দেশান্তর। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের অবদান মোট জিডিপির ১২ শতাংশের মতো। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রবাসী এসব শ্রমিক যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে, তা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেক। বিগত ৪০ বছরে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ প্রবাসী বিদেশে গমন করেছে এবং তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজেদের কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ নিয়মিত পাঠিয়ে তারা এ দেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে গড়ে তোলে।

আমরা যারা বাংলাদেশের বাইরে বসবাসরত বাংলাদেশি, কেউ কেউ দ্বৈত নাগরিকত্বে অন্য দেশেরও নাগরিক তাদের কষ্ট বোঝেন না অনেক মাননীয়ই। দুঃখ বা বেদনাগুলো দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়া, কানাডার বাঙালিদের কষ্ট ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমজীবী বাঙালির কষ্ট এক নয়। এখানে একটা বড় তফাত হলো পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি বা নাগরিকত্ব। যারা বিদেশে থাকতে পারবেন না বা সব সময়ের জন্য বিদেশে বসবাস করতে পারবেন না তাদের সমস্যা মৌলিক। তারা দেশে টাকা পাঠান নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ভালোভাবে বাঁচার জন্য। এখানে সবচেয়ে বড় বাধা মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালরা। রেমিট্যান্স পাঠানোর কাজটিতে কী কী বাধা বা কোথায় এর অন্তরায় লুকিয়ে সবাই জানেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এর দায় কাদের বা সমাধান করবে কে?

সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করা। সাধারণ প্রবাসীদের বেলায় পদপদবি, পুরস্কার কিংবা অর্জনের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত আমাদের দেশের বড় মানুষেরা। এ কুণ্ঠার কারণ আমরা জানি। কারণ তাদের বেশিরভাগই দেখতে বড় হলেও মূলত এরা বড় কেউ না। নানা গোঁজামিলে তাদের বড় করে তোলা এবং তাদের হাতে পাওয়ার থাকায় দেশের আজ এ অবস্থা। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সব জায়গায় যে ভোগান্তি তার হিসাব রাখে না কেউ।

যাদের অর্জন সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে কিছুতেই ঠেকানো যায় না, কেবল তখনই তাদের স্বীকৃতি মেলে। বাংলাদেশ বাংলা ভাষা আর তার সংস্কৃতি জীবন নিয়ে বাঁচা যেকোনো প্রবাসীই দেশের সম্পদ। প্রবাসীদের অর্জিত সম্পদ বা টাকা পয়সার পাশাপাশি মেধাবিনিময় গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি। মোদ্দা কথা, আমাদের দেশের অন্য যেকোনো খাতের মতো প্রবাসীকল্যাণ খাতও প্রশ্নমুক্ত নয়। তাদের সদিচ্ছা থাকলেও উদ্যোগ দেখা যায় না। কিছু গৎবাঁধা পরিসংখ্যান বা তালিকা দিয়ে আসলে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমরা এয়ারপোর্টে গিয়ে যেসব অনভিপ্রেত প্রশ্ন বা বিপত্তির মুখোমুখি হই এর উত্তর বা সমাধান জানা দরকার। যেমন ধরুন আপনি কেন দেশে এসেছেন? এ প্রশ্ন দিয়ে শুরুটা যেকোনো নাগরিক বা বাংলাদেশির জন্য অমর্যাদাকর। একবার ভাবুন, যে মানুষটি দেয় এবং দিতে এসেছে তাকেই নাজেহাল করছে গ্রহীতা!

ভাবি নতুন প্রজন্ম নিয়ে। তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে এগিয়ে। তারা যখন দেখে বা দেখবে একজন ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান বা নেপালি প্রবাসী ভিআইপি মর্যাদা পান, তাদের দেশে তারা গর্ব নিয়ে অবাধে চলাফেরা করতে পারেন; তখন কি তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে না? সাধারণ মানুষ প্রবাসীদের বরণ করতে এবং তাদের ভালোবাসা দিতে কার্পণ্য করে না। যত দোষ ওই নন্দ ঘোষ সিস্টেমে। এ ব্যাপারে আমাদের দূতাবাসগুলোর ভূমিকা থাকার কথা হলেও এর কাঙ্ক্ষিত নজির নেই। যদি থাকেও তা ছিটেফোঁটা। মনে রাখতে হবে, দেশের বাইরে প্রায় ২ কোটি বাংলাদেশির বসবাস। তারা সচ্ছল ও আন্তরিক। তাদের কর্ম, মেধা, অর্থের সঠিক মূল্যায়ন না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। যেকোনো একাডেমি থেকে যেকোনো দপ্তরের দায়িত্বশীলদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে যে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা শক্তি। এই শক্তির সঠিক ব্যবহারেই ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

প্রবাসী লেখক

The Future Of Smart Connectivity

Flixza

Fastest Performance

DOMAIN, HOSTING, SSL
WEBSITE DESIGN

go Flixza

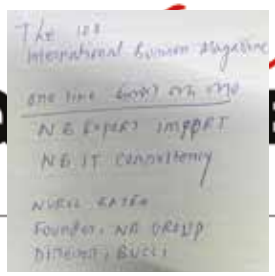

... Your Business Using

Q... E, BARCODE & NFC CARD

OUR SISTER CONCERNS

ihope print.com · ellexo LIFESTYLE INC · GO MUSIC · LUDO MUSIC · Galaxy media · save the smile · GO EXPRESS

FLIXZA GLOBAL LLC

169-22 HILLSIDE AVE, FL 2, JAMAICA , NY 11432

sagar@ flixzaglobal.com, goflixza@gmail.com, 929-538-7903

দেশের উন্নয়নে রেমিটেন্স যোদ্ধা

ড. মোঃ আইনুল ইসলাম

দেশের অর্থনীতির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা যে কয়টি খাতের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। সরকারি হিসেবে বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশি কর্মী আছেন ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি। যাদের ঘাম ও শ্রমে উপার্জিত অর্থ দেশে এলেই তাকে আমরা প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স বলে থাকি। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রমাণ হয়েছে করোনাভাইরাস সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির সময়। করোনার পরপরই শুরু হওয়া বর্তমান বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটেও প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রাই বাংলাদেশের বড় সম্বল।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার পর, বিশ্বব্যাপী দেউলিয়া আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যত নিয়েও যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাতেও আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে এই রেমিট্যান্স। বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত বহুপক্ষীয় ট্রাস্ট ফান্ড দ্য গোবাল নলেজ পার্টনারশিপ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্প্রতি জানিয়েছে, সব আশঙ্কা দূর করে ২০২০ সালে বাংলাদেশ ২২ বিলিয়ন বা ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ৮৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার (১ ডলার = ৮৪ টাকা) রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পেয়েছে। এর ফলে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে প্রবাসী আয় প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ২০১৯ সাল থেকে এক ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে সপ্তম স্থানে উঠে আসে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এ অর্থ ব্যয় হয়। রেমিটেন্স আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ ব্যয় হয় দৈনন্দিন খরচের খাতে। এতে ওই পরিবারগুলোর দারিদ্র্য দূর হচ্ছে।

রেমিট্যান্স পাওয়ার পরে একটি পরিবারের আয় আগের তুলনায় ৮২ শতাংশ বাড়ে। সংখ্যাতাত্ত্বিক এসব হিসাবনিকাশের বিপরীতে যদি বলা হয়- বাংলাদেশ প্রবাসীদের কী দিচ্ছে- তাহলে আমাদের নিরাশ হতে হয়। সরকারের মতে, ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি প্রবাসীর অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব শ্রম কল্যাণ উইংয়ের। কিন্তু বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশি কর্মীরা গেলেও তাদের সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষায় ২৬টি দেশের বাংলাদেশ মিশনে শ্রম কল্যাণ উইং আছে মাত্র ২৯টি, যার মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও ইতালিতে ২টি করে।

সৌদি আরবে ২৩ লাখের বেশি বাংলাদেশী শ্রমিকের জন্য যে ২টি উইং আছে, সেখানে জনবল মাত্র ১২ জন। এত বিপুল সংখ্যক

প্রবাসীর সেবা নিশ্চিত করা এত ক্ষুদ্র জনবল দিয়ে কীভাবে সম্ভব? আর যেসব দেশে উইং নেই, তাদের জন্য কী হবে? বিপদগ্রস্ত-দুর্ঘটনাকবলিত-বঞ্চিত প্রবাসীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, নারী কর্মীদের নিগ্রহ থেকে বাঁচানো, প্রবাসে লাশ হওয়া বাংলাদেশীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষতিপূরণ আদায়সহ প্রবাসীদের যাবতীয় সমস্যার দেখভাল করাই মূলত শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কাজ। কিন্তু প্রবাসীরা দীর্ঘদিন থেকেই এ নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে আসছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের ইমিগ্রান্ট নাগরিকদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। উন্নত সব দেশেই প্রায় একই অবস্থা।

নাগরিক হয়েও যদি তারা তৃতীয় শ্রেণির পরিগণিত হন, তাহলে অদক্ষ ও অল্প দক্ষ শ্রমিক-কর্মীরা কী সমাদর পান, তা সহজেই অনুমেয়। প্রবাসীদের আমরা অর্থনীতির মেরুদ- বলি। অথচ প্রায়ই দেখা যায়, নিজের দেশের বিমানবন্দরে প্রবাসী কর্মীদের প্রচণ্ড দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। হয়রানির শিকার হওয়া যেন তাদের নিয়তির লিখন।

১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবাসীরা প্রায় ১১.৮ মিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স প্রদান করেছিলেন। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে যা ৭৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এরপর থেকে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রতিবছরই দেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেড়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৬-৭ লাখ মানুষ বিভিন্ন দেশে যায়। প্রতিমাসে বাংলাদেশ থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষ বিদেশে যায়। এসব প্রবাসী বছরে গড়ে ১৮ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠায়। স্থানীয় মুদ্রায় যা ১ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা। যা দেশের মোট রফতানি আয়ের অর্ধেকের বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত ৩০ জুন ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে, তাতে বলা হয়েছে, রেমিট্যান্স উর্ধমুখী হবে এবং চলতি অর্থবছরে গত বছরের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি আসবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, ১ জুলাই শুরু হওয়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২৮ দিনে গড়ে প্রতিদিন ৭ কোটি ডলার করে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত অর্থবছরে গড়ে প্রতিদিন ৫ কোটি ৭৬ লাখ ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে। ওই সময়ে ২ হাজার ৪৭৮ কোটি (২৪.৭৮ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। ওই অর্থবছরে প্রতিদিন গড়ে ৬ কোটি ৭৯ ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। কোভিডের কারণে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ২.৫ শতাংশ প্রণোদনার কারণে সামষ্টিক পর্যায়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পায়। প্রতিবছর বাজেট এলেই প্রবাসীরা অপেক্ষা করেন বাজেটে তাদের জন্য কিছু আছে কি না, তা দেখতে। বেশির ভাগ সময় তাদের নিরাশ হতে হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুরুতে প্রবাসী আয় কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করায় বৈধপথে প্রবাসী আয় পাঠানোয় অধিকতর উৎসাহ দিতে সরকার প্রণোদনার হার ০.৫ শতাংশ বাড়িয়ে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করে। প্রবাসীরা এতে খুশি হয়েছেন। কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের অনেক দাবি পূরণ এখনও অধরাই রয়ে গেছে। অথচ দেশে জীবনযাত্রার মান, কাঠামোগত নির্মাণ, আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে রেমিটেন্স। দেশের বিপুলসংখ্যক প্রবাসীরা তাদের পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত টাকা পাঠায়।

ফলে, সরকারের বিপুলসংখ্যক পরিবারের দায়ভার নিতে হয় না। তা ছাড়াও প্রবাসীরা যদি নিজের সন্তান বা নিকট আত্মীয় একজনকে আত্মকর্মসংস্থান বা কুটিরশিল্প স্থাপনের জন্য অর্থ সহায়তা করে, তাহলে একসঙ্গে কয়েক যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যার লাঘব হবে। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হয়। প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে কেমন অবদান রাখে তা প্রবাসী-অধ্যুষিত এলাকা এবং অন্য এলাকার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায়। প্রবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার হার ও জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি হয়।

বিএমইটির গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পুরুষ প্রবাসে গেছে কুমিল্লা জেলা থেকে। তারপরই রয়েছে চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালী। অন্যদিকে সবচেয়ে কম পুরুষ প্রবাসে গেছে তিনটি পার্বত্য জেলা এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে। প্রবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় জমির মূল্য, আবাসন ব্যবসা, বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতাল প্রভৃতির সংখ্যা অন্য এলাকা থেকে অনেক বেশি। প্রবাসী-অধ্যুষিত জেলার মানুষের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু ব্যয়ক্ষমতা অন্য জেলার মানুষের তুলনায় বেশি।

প্রতিটি অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় তারা আরও বেশি রেমিটেন্স পাঠান। দেশের অর্থনীতিতে আশার আলো জ্বালান। আমরা তাদের এই অবদানের কতটা মূল্যায়ন করি? কতটা নিরাপদ তাদের প্রবাসজীবন? কিংবা কী প্রতিদান তারা পেয়েছেন? আড়ালে-আবডালে তাদের আমরা 'কামলা' বলি। বাংলাদেশের শ্রমিক অদক্ষ বা নিরক্ষর হওয়ায় তাদের নিম্নমানের কাজ করতে হয়। সেসব কাজের ঝুঁকি বেশি, কিন্তু বেতন অপর্যাপ্ত।

তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। প্রবাসীদের সব সমস্যার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। তাদের ভোগান্তির শুরু হয় ঘর থেকে। রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের বেশির

USA-BANGLADESH BUSINESS LINKS

The USA boasts the second largest number of Non-resident Bangladeshis and the third-highest remittance sender for Bangladesh

To connect your bank with this huge potential remitter

We do

- Remittance Road Show
- Remittance Campaign
- Remittance Seminar

and

- Remittance related Events in USA

CONNECT US
Email: usabdbusinesslinks@gmail.com
Mobile: +1(347) 656 5106

www.ubbl.org

ভাগ গ্রামের অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ। দালালরা প্রবাস জীবনের কষ্টের কথা গোপন করে উচ্চ বেতন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কাজের জায়গা, বিলাসী জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখিয়ে বিদেশ পাঠানোর ফাঁদে ফেলে তাদের। তারপর পাসপোর্ট, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ডাক্তারি পরীক্ষা, ভিসা, ইমিগ্রেশন, স্মার্টকার্ড এবং বিমান ভাড়া ইত্যাদির কথা বলে হাতিয়ে নেয় প্রয়োজনের কয়েকগুণ টাকা।

সহজ-সরল মানুষগুলো প্রবাসে গিয়ে দুর্দিন পার করে। দেশে মাত্র দুটি ব্যাংক প্রবাসীদের বিদেশ যেতে ঋণ দেয়- রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক অগ্রণী ও বেসরকারি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। তাদের প্রদানকৃত ঋণও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক পাঠানোর খরচও তুলনামূলক অন্যদেশের থেকে বেশি। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এক জরিপ শেষে বাংলাদেশের অভিবাসন ব্যয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বলে তথ্য প্রকাশ করে। সংস্থাটির মতে, পুরুষ কর্মীর ক্ষেত্রে তা ৭ লাখ টাকা এবং মহিলা কর্মীর ক্ষেত্রে তা ৯৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা মাইগ্রেশন ডেটা পোর্টাল ২০১৭ সালের উপাত্তের ভিত্তিতে জানিয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে একজন ভারতীয় শ্রমিকের কাজ পেতে খরচ হয় ১ হাজার ১৫৬ ডলার বা ১ লাখ টাকা, যা সে দুই মাসে আয় করতে পারে।

একজন নেপালি খরচ করে ১ হাজার ৮৮ ডলার বা ৯৫ হাজার টাকা, যা তিন মাসের আয়। সবচেয়ে কম খরচ হয় ফিলিপিন্সের শ্রমিকের, যার অঙ্ক মাত্র ৪১৪ ডলার বা ৩৬ হাজার টাকা, যা তারা এক মাসেই আয় করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শ্রমিক ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা খরচ করে কাতারে যান এবং ১৫-২০-২৫ হাজার টাকার নিম্নবেতনেই কাজে নেমে পড়েন। এত অভিবাসন ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা আয় করতে তার বছরের পর বছর সময় লাগে। অনেক সময় বিদেশের কর্মস্থলে অমানবিক অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশী শ্রমিক-কর্মীকে বাধ্য হয়েই দাসের জীবন কাটাতে হয়। কারণ, বিপুল অর্থ খরচ করে তাকে প্রবাসে যেতে হয়েছে। যা তিনি জমি বেচে অথবা এনজিওর উচ্চ সুদে ঋণ করে সংগ্রহ করেছেন।

সরকারের যথাযথ নজরদারি ও অবহেলার কারণে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের ওপর নির্ভরশীল। বাধ্য হয়ে বিদেশগামীরাও এসব মধ্যস্বত্বভোগীর ওপর নির্ভরশীল। এই অবস্থার জরুরী অবসান প্রয়োজন।

প্রবাসীদের ভোগান্তি দূর করতে প্রবাসজীবনের শুরু থেকেই কাজ করতে হবে। প্রবাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দালালের ফাঁদে না পড়েন। মানব পাচারকারীদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্মূলে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের শ্রমশক্তি দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কর্মসূচি নিতে হবে। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে।

রেমিট্যান্সের প্রবাহ ঠিক রাখতে দক্ষদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিমানবন্দরের আসা-যাওয়ায় চরম ভোগান্তি দূর করতে হবে। প্রবাসীদের যাতায়াতের জন্য দেশের বিমানবন্দরসমূহে পৃথক চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারাই আমাদের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কমাতে হবে অভিবাসন ব্যয়। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় অভিবাসন হলে ব্যয়ের বিষয়টি বিদেশে গমনেচ্ছু ব্যক্তির স্বার্থে করতে হবে। প্রবাসে তাদের দুর্ভোগ নিরসনে আগামী পাঁচ বছরে ১০ হাজারের উর্ধে প্রবাসী-অধ্যুষিত দেশে প্রবাসী উইং প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দূতাবাস ও মিশনগুলোর স্বদেশি ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সেবা দিতে হবে।

সরকারকে শ্রমবাজার বৃদ্ধি ও প্রবাসীদের কল্যাণ বিষয়ে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রবাসীদের সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ বিস্তৃত করতে হবে, যাতে তারা উৎসাহিত হন। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বৈদেশিক রেমিট্যান্সের গুরুত্বকে অনুধাবন করে জনশক্তি রফতানি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারীভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যার সমস্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে দেশের বেকার সমস্যার নিরসনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশে বিশাল সুযোগ হবে। বিদেশ গমনেচ্ছুদের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিশেষায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের বিদেশ গমনের জন্য সহজ শর্তে সরকারিভাবে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো, যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের টাকার অভাব। এ সমস্যা দূরীকরণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এর ফলে সরকার একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। যে নীতিমালায় প্রবাসীদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।

লেখক :
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

There is no clean coal technology

কয়লা ধুইলে ময়লা যায়না

STOP COAL BASED POWER PLANTS

COAL IS HARMING US

Coal pollutes the air and releases carbon

Acid Rain

Lung disease, cancer

Global warming

Coal pollutes rivers

Pollutes drinking water table

COAL FREE WORLD

Make World Coal Free

Learn more at
www.coalfreeworld.org

SIERRA CLUB

BEYOND COAL

MHC
MARKS HOME CARE

MARKS HOME CARE

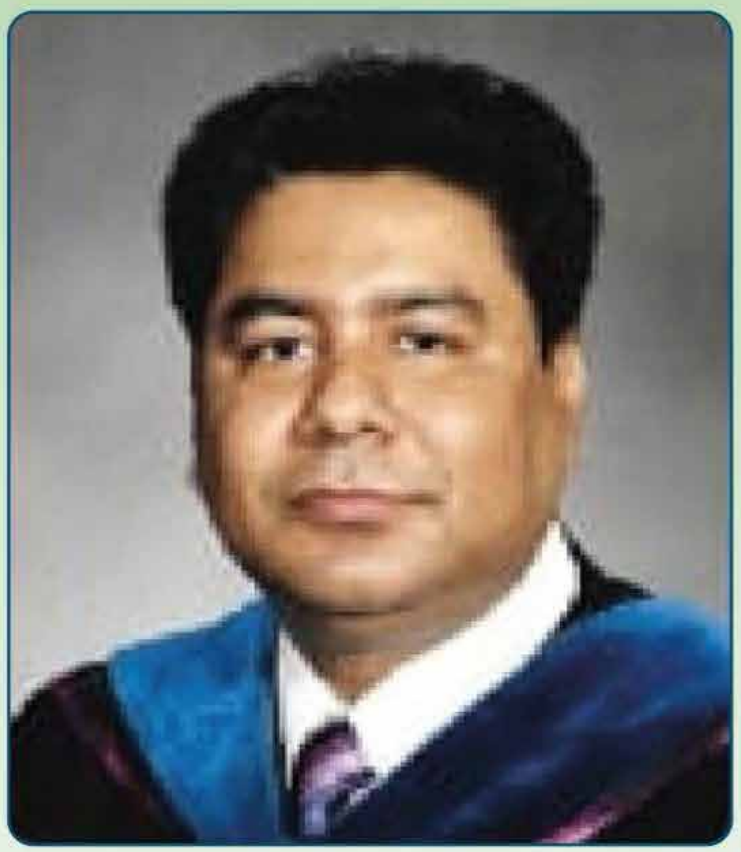

হোম কেয়ার সার্ভিস

সর্বোচ্চ পেমেন্ট পেতে
আজই যোগাযোগ করুন

Mohammad Amir Hossain (Kamal)
Business Development Director
Cell: 917-693-8661
Email: mahk69@markshhc.com
Web: www.markshhc.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd | Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C | Ozone Park, NY 11416

Bangladesh Remittance Fair 2025

4th Bangladesh Remittance Fair 2025

New York

19 - 20 April 2025

LaGuardia Marriott, New York, USA

Showcase

Conference

Awards

Organized by

BUCCI
Bangladesh-USA Chamber of Commerce and Industry

USA-BANGLADESH BUSINESS LINKS

SEE YOU THERE!

www.bangladeshremittancefair.com

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

PCA AND CDPAP SERVICE

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে **৮০০** ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।

Shah Nawaz MBA
President & CEO, **646-591-8396**

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115

ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

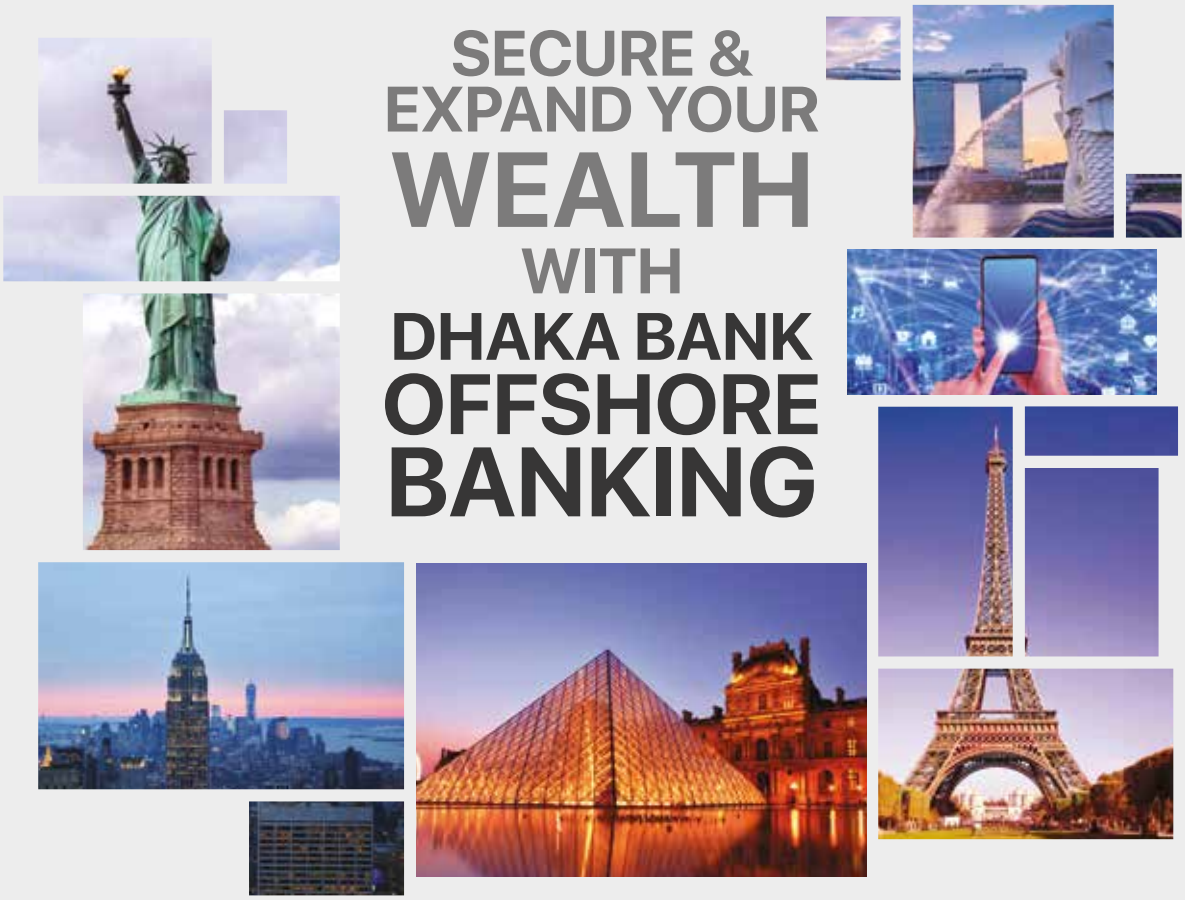

SECURE &
EXPAND YOUR
WEALTH
WITH
DHAKA BANK
OFFSHORE
BANKING
Discover New Horizon of Offshore Banking Opportunities in Bangladesh
Person of any nationality residing outside Bangladesh (including NRBs) / companies, investors etc. registered and operating outside Bangladesh / Bangladeshi residents on behalf of a non-resident can open a Dhaka Bank Offshore Term Deposit Account in US Dollar or in EURO
Enjoy Interest
Up To
8.45%*
p.a.
(completely tax-free)*
With our Offshore Term Deposit accounts, you will also enjoy:
Flexible Tenors from 03 Months to 05 Years
Zero Bank Charges
Principal and Interest are Freely Remittable Abroad
Special Offer for deposits over USD or EURO 25,000
Access to 1500+ international lounges with Lounge Key.
Meet & Greet services at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka
Pick & Drop services at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka*
*Conditions Apply
16474
+8809678016474
For ISD/Overseas Call
To learn more and to open account, please visit
https://dhakabankltd.com/obu/
DHAKABANK
PLC.